সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৩৯-৪০
২০ জুলাই ২০২৬, সোমবার

কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, আর্জেন্টিনা

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ

বার্ষিক : ৭০০ টাকা

ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আন্তর্জাতিক

মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-

Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৩৯-৪০ সংখ্যা
২০ জুলাই-২০২৬ ঈসায়ী
০৫ শ্রবাণ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৫ সফর-১৪৪৮ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

✍ মণির খনি: ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ ০২
✍ সম্পাদকীয়: আত্মমানবতার সেবায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ০৪
◈ দারসুল কুরআন– কুরআনের নিরন্তন চ্যালেঞ্জ: পারলে অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো!
✍ আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
◈ দারসুল হাদীস: মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপাচার
✍ গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
◈ ইসলামী প্রবন্ধ: আত্মীয়তার সম্পর্ক ও মেহমানদারি
✍ শাইখ মো. আব্দুল বারী ফরাজী- ১১
◈ শিক্ষা ও সভ্যতা– ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
✍ আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৩
◈ স্মৃতিচারণ: স্মৃতির বাতায়নে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)
✍ ডা. সুলতান আহমদ- ১৬
◈ ক্বাসাসুল হাদীস: মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে বৃদ্ধা নারীর জান্নাত
✍ আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ১৯
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ– বিশ্বকাপ ফুটবল: মোহাচ্ছন্ন যুবসমাজ
✍ আহমাদ বিন আব্দুস সালাম- ২০
◈ মহিলা জগত: কুরআন হাদীসের আলোকে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের বিধান
✍ আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমাদ- ২৪
◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান: জবাব ✍ সুপ্ত রায়হান সজিব- ২৬
✍ কবিতা ২৯
✍ জমঈয়ত সংবাদ ৩০
✍ স্বাস্থ্য সচেতনতা ৩৪
✍ ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৬
✍ প্রচ্ছদ রচনা: কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারল সেন্টার
✍ আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৭

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭, টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি– ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ

মহান আল্লাহর বাণী

﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বলো: তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য করো; এবং তোমরা যে সব সৎকাজ করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক রূপে অবগত।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৫)*

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) এক শত শস্য এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৬১)

﴿لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

"দান খয়রাত ঐ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর কাছে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলিল চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে যাঞ্চা করে না এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় করো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৭৩)*

﴿وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" *(সূরা আল-হাশ্‌র: ৯)*

﴿وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا﴾

"তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে– কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"

(সূরা আল-ইনসান: ৮-৯)

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

"কিন্তু সে গিরিসংকটে প্রবেশ করল না। তুমি কি জানো, গিরিসংকট কি? এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান। অথবা দুর্ভিক্ষের সময় আহার্য দান– পিতৃহীন আত্মীয়কে, অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।"

(সূরা আল-বালাদ: ১১-১৬)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

❁ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সহজ করে দেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে, মহান আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্যে থাকেন।

(সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯)

❁ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِيْ اللّٰهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: "সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না: **১.** ন্যায়পরায়ণ শাসক। **২.** সেই যুবক, যে মহান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। **৩.** সেই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। **৪.** এমন দুই ব্যক্তি, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে; তারা এ ভালোবাসার ওপরই একত্রিত হয় এবং এ ভালোবাসার ওপরই পৃথক হয়। **৫.** সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন ও সুন্দরী নারী (অবৈধ সম্পর্কে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি।' **৬.** সেই ব্যক্তি, যে এত গোপনে দান করে যে তার বাম হাতও জানতে পারে না তার ডান হাত কী দান করেছে। **৭.** সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০, ১৪২৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৩১)*

❁ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করেন। একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! যে দান করে তাকে আরো দান করুন।' আর অন্যজন বলেন, 'হে আল্লাহ! যে কৃপণতা করে তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।'

(সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৪২; সহীহ মুসলিম- হা. ১০১০)

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

افتتاحية / সম্পাদকীয়

আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এই ভূখণ্ডে মানুষের জীবন যেমন নদীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, তেমনি বন্যাও এ দেশের এক নির্মম বাস্তবতা। প্রায় প্রতি বছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল বন্যার কবলে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম, কক্সবাজারসহ পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ভয়াবহ বন্যা আঘাত হেনেছে, তা শুধু ঘরবাড়িই ভাসিয়ে নেয়নি; হাজারো পরিবারের স্বপ্ন, জীবিকা ও নিরাপত্তাবোধও বিপর্যস্ত করেছে। বহু মানুষ এখনো আশ্রয়কেন্দ্রে কিংবা ভাঙাচোরা ঘরে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিশুদ্ধ পানির সংকট, খাদ্যের অভাব, শিশুদের অপুষ্টি, পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি এবং জীবিকা হারানোর কষ্ট- সব মিলিয়ে গভীর এক মানবিক সংকট।

এমন সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো কেবল রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়; এটি সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিক, প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিটি ধর্মীয় সংগঠনেরও নৈতিক ও ঈমানি দায়িত্ব। ইসলামের শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সৃষ্টির সেবা স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।" এই মহান আদর্শই মুসলিম সমাজকে যুগে যুগে মানবকল্যাণের পথে পরিচালিত করেছে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দাওয়াহ-তাবলীগ, তানযীম, তাহরীক এবং তালীম-তারবিয়াহর পাশাপাশি খিদমতে খালক- অর্থাৎ- আর্তমানবতার সেবাকে সংগঠনের অন্যতম মৌলিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ, দারিদ্র্য, শীত, মহামারি কিংবা অন্য যেকোনো মানবিক সংকটে সংগঠনের নেতাকর্মীরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দেওয়া, একজন অসহায়কে আশ্রয় দেওয়া কিংবা একজন বিপন্ন মানুষের চোখের অশ্রু মুছে দেওয়াও এক মহান ইবাদত।

সাম্প্রতিক বন্যার খবর পাওয়ার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত করে দুর্গত এলাকায় ছুটে যান। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সমন্বয় করে জরুরি ত্রাণ ও পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমকে গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নেতৃত্বের এই উপস্থিতি শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন নয়; এটি বিপন্ন মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক বাস্তব প্রতিফলন।

তবে অভিজ্ঞতা বলে, বন্যার পানি নেমে গেলেই দুর্ভোগের অবসান হয় না; বরং তখনই শুরু হয় আরো কঠিন সংগ্রাম। ভেঙে যাওয়া ঘর পুনর্নির্মাণ, কৃষকের নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পুঁজি ফিরিয়ে দেওয়া, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন সচল রাখা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা এবং রোগব্যাধির বিস্তার রোধ- এসবই দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের অংশ। তাই কেবল তাৎক্ষণিক ত্রাণ নয়, টেকসই পুনর্বাসনই হওয়া উচিত আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য।

এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস জরুরি ত্রাণের পাশাপাশি বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু একটি জাতীয় মানবিক উদ্যোগ কেবল একটি সংগঠনের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, শিক্ষক, প্রবাসী, তরুণ সমাজ, সমাজসেবী এবং সকল দানশীল ব্যক্তিকে মানবতার এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সময় এখনই।

আজ হয়তো দুর্গত মানুষগুলো আমাদের আত্মীয় নয়, প্রতিবেশী নয়; কিন্তু তারা আমাদেরই দেশের মানুষ, আমাদেরই ভাই-বোন। তাদের শিশুর কান্না, মায়ের অসহায় দৃষ্টি, বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাস এবং গৃহহারা মানুষের অনিশ্চয়তা আমাদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মানবিক বিপর্যয়ের এই মুহূর্তে নির্লিপ্ত থাকা কোনো সভ্য সমাজের পরিচয় হতে পারে না।

আসুন, আমরা সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসি। কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ খাদ্য দিয়ে, কেউ ওষুধ দিয়ে, কেউ শ্রম দিয়ে, কেউ আবার সময় দিয়ে বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াই। মনে রাখতে হবে, একটি পরিবারের পুনর্বাসনে আমাদের সামান্য সহযোগিতাও হতে পারে তাদের নতুন জীবনের সূচনা।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সেই বিশ্বাস থেকেই দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানায়! আসুন, আমরা সবাই মিলে বন্যাকবলিত মানুষের হাত ধরি। ত্রাণের সীমা অতিক্রম করে পুনর্বাসনের দীর্ঘ পথেও তাদের পাশে থাকি। কারণ সৃষ্টির সেবাতেই নিহিত রয়েছে স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

দারসুল কুরআন / درس القرآن:

কুরআনের নিরন্তন চ্যালেঞ্জ: পারলে অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো!

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, যদি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে তার মতো একটি সূরা এনে দাও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা তোমাদের সাক্ষীগণকে/সাহায্যকারীদেরকে (সাহায্যের জন্য) ডাকো; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

رَيْبٍ -সন্দেহ, نَزَّلْنَا -আমি অবতীর্ণ করেছি, عَبْدِنَا -আমার বন্দা, فَأْتُوْا -নিয়ে আসো (অক্ষমতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ), بِسُوْرَةٍ -কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ (সূরা), مِّنْ مِّثْلِهٖ -কুরআনের মতো, তার অনুরূপ, شُهَدَآءَكُمْ -সাহায্যকারী ও সমর্থক, إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং বান্দাদের প্রতি অসংখ্য নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতাংশে তিনি নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা, কুরআনুল কারীমের অলৌকিকতা, চিরন্তন মু'জিজাসহ এটি যে মহান আল্লাহরই অমীয় বাণী –তার অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

তাফসীর (বিশ্লেষণ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾

অর্থাৎ- "আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে।"

মক্কার কাফির-মুশিরকরা কুরআনকে মহান আল্লাহর কালাম হিসেবে বিশ্বাস করতো না; বরং একে মানুষের মনগড়া রচনা বলে অপবাদ দিত। তাদের এই চরম অবিশ্বাস ও সংশয়কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে إِنْ (যদি-শর্তবাচক অব্যয়) এবং رَيْبٍ (সন্দেহ/সংশয়) শব্দ দু'টি দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

رَيْبٍ শব্দের বিশ্লেষণ: আরবী ভাষায় 'রাইব' (رَيْبٍ) এমন সন্দেহকে বলা হয়, যার সাথে অস্থিরতা, দ্বিধা এবং কুধারণা মিশে থাকে। ইমাম বাগভী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরে বলেন–

لأن الله تعالى علم أنهم شاكون.

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানতেন যে, তারা বাস্তবিকই গভীর সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত।

نَزَّلْنَا শব্দের তাৎপর্য: مِّمَّا نَزَّلْنَا বলে তিনি কুরআনকে বুঝিয়েছেন। এখানে أَنْزَلْنَا শব্দটি ব্যবহার না হয়ে نَزَّلْنَا শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। কারণ কুরআন ধীরে ধীরে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অংশে নাযিল হয়েছে। আরবি ব্যকরণ অনুসারে (فَعَّلَ) এই বাবের ক্রিয়া সাধারণত কাজের ধারাবাহিকতা ও পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করে।

আল্লামা যামাখশারী তাঁর আল-কাশ্শাফ গ্রন্থে একটি সূক্ষ্ম কারণ উল্লেখ করে বলেন- আরব মুশরিকরা আপত্তি করে বলত:

لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة.

অর্থাৎ- তার উপর তাহলে কুরআন কেন একবারেই নাযিল করা হলো না?

তাদের এই আপত্তির প্রেক্ষিতে نَزَّلْنَا শব্দের ব্যবহার অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও যথার্থ হয়েছে।

عَبْدِنَا শব্দের মর্যাদা: তারপর আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পরিচয় হিসেবে عَبْدِنَا শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে একদিকে তাঁর নবুওয়াতের সম্মান প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে এটি প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদা। কারণ, ইবাদত

* *এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*
[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩।*

ও দাসত্বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী (ﷺ)-এর উপর তাঁর কালাম (কুরআন) অবতীর্ণ করে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানিত করেছেন।

অবিশ্বাসীদের অপবাদ ও আল্লাহ তা'আলার চ্যালেঞ্জ: তৎকালীন আরবরা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের ওপর অত্যন্ত অহংকারী ছিল। তারা নিজেদেরকে 'আরব' (স্পষ্টভাসী) এবং বিশ্বের বাকি সকলকে 'আজম' (বোবা বা মূক) মনে করত। উম্মী নবী মুহাম্মদ (ﷺ) যখন প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই কুরআনের অতুলনীয় ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্র উপস্থাপন করলেন, তখন আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। কুরআনের এই অলৌকিক সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বকে মোকাবেলা করতে না পেরে ও নিজেদের পরাজয় ঢাকতে তারা একে 'উচ্চমার্গীয় কবিতা', 'গনকের অতীন্দ্রিয় কথা', 'জাদু' বা 'পাগলের প্রলাপ' বলে অপবাদ দেয়। তাদের এই অপবাদের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর অবতীর্ণ বাণীর মাধ্যমেই ধাপে ধাপে একটি যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া এই ঐতিহাসিক সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জটিকে 'তাহাদ্দি' বা 'ঐশী অলৌকিকত্বেও চ্যালেঞ্জ' বলা হয়। চ্যালেঞ্জের প্রথম স্তরে মহান আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীর সমকক্ষ একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনার জন্য মানব ও জিন উভয় সম্প্রদায়কে সামষ্টিক আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ﴾

অর্থ- "বলো, যদি চাও জিন্ ও মানুষ সকলে মিলে কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচণা করো!"[২]

অবিশ্বাসীদের অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার পর চ্যালেঞ্জের স্তরকে আরো সহজ করে দেওয়া হয়। এবার আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ১০টি সূরা রচনার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

অর্থ- "বলো, 'তাহলে তোমরা এর মতো দশটি সূরা রচনা করে আনো, আর (এ কাজে সাহয্য করার জন্য) আল্লাহকে ছাড়া যাকে ডাকতে চাও ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"[৩]

চ্যালেঞ্জের চূড়ান্ত পর্যায়ে অলৌকিকত্বের কষ্টিপাথরকে আরো সংকুচিত করে মাত্র একটি সূরায় নিয়ে আসা হয়। সূরা আল-বাক্বারাহ্‌র এই ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়,

﴿فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ﴾

অর্থাৎ- "অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো।"

এখানে فاء (ফা) এসেছে পূর্ববর্তী اِنْ (যদি-শর্তবাচক অব্যয়)'র উত্তরে। পূর্বে বলা হয়েছে, ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ﴾ অর্থ- "যদি তোমরা সন্দেহে থাকো।" উত্তরে বলা হচ্ছে- فأتوا অর্থ- তাহলে নিয়ে আসো। অর্থাৎ- যদি সন্দেহ করো, তাহলে এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো। فأتوا এটি এমন একটি আদেশ যার উদ্দেশ্য তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করা। এটাকে বলা হয়- أمر التعجيز অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা সত্যিই চাননি যে তারা কুরআনের মতো সূরা রচনা করুক; বরং উদ্দেশ্য ছিল- তাদের অক্ষমতা প্রমাণ করা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জানতেন- তারা কখনও তা পারবে না।

'সূরা' শব্দটির বিশ্লেষণ: কুরআনের কিছু নির্দিষ্ট অংশের জন্য 'সূরা' শব্দকে একটি সাধারণ নাম হিসেবে ব্যবহার করা কুরআন নিজেই চালু করেছে। 'সূরা' নামে কুরআনের অধ্যায়গুলোর নামকরণ মানুষের তৈরি নয়। কুরআন নিজেই এই পরিভাষা প্রবর্তন করেছে। যেমন- কুরআনে এসেছে- ﴿فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ﴾ অর্থ- "তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো।" আরবী سورة (সূরা) শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। **এক-** سورة শব্দটি এসেছে أسأرت শব্দ থেকে। অর্থ হলো- কিছু অবশিষ্ট রাখা বা উত্তম অংশ। **দুই-** سور থেকে এসেছে। অর্থ- প্রাচীর, শহর বা গ্রামের চারপাশের ঘের ইত্যাদি। বাগভী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন- সূরা হলো কুরআনের এমন একটি অংশ যার শুরু ও শেষ নির্ধারিত। তিনি আরো বলেন- সূরা এ কারণে সূরা নামে পরিচিত যে, এর পাঠকারী উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। একজন ব্যক্তি পুরো কুরআনের সূরাগুলো সম্পূর্ণ করলে সে ক্রমান্বয়ে উচ্চ মর্যাদার স্তরে পৌঁছে যায়। সুতরাং সূরাকে 'সূরা'

[২] *সূরা আল-ইসরা: ৮৮।*

[৩] *সূরা হূদ: ১৩।*

নামে নামকরণ যথার্থ হয়েছে। 'সূরা' নামটি কেবল কুরআনের নির্দিষ্ট অংশগুলোর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্য আসমানী কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে নয়।

من مثله-এর বিশ্লেষণ: এখানে উল্লেখিত من-কে নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। **প্রথম মত:** من زائدة অর্থাৎ- এখানে অতিরিক্ত হরফ। তখন এর অর্থ হবে فأتوا بسورة مثله "এর অনুরূপ একটি সূরা আনো।" **দ্বিতীয় মত:** من للتبعيض অর্থাৎ- এর মতো কারো কাছ থেকে অথবা এর অনুরূপ কোনো কিতাব থেকে। مثله-এর ه-এর মারজা' নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। জমহুর মুফাস্‌সিরদের মতে- الضمير في مثله عائد على القرآن. অর্থাৎ- مثله-এর সর্বনাম কুরআনের দিকে ফিরে। তখন অর্থ হবে- কুরআনের মতো একটি সূরা নিয়ে এসো। ক্বাতাদাহ্ ও মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। ভিন্ন মতে- يعود على التوراة والإنجيل অর্থাৎ- مثله-এর সর্বনাম তাওরাত-ইনজিলের দিকে ফিরে। তখন অর্থ হবে- তাওরাত-ইনজিলের মতো কোনো আসমানী কিতাব থেকে একটি সূরা নিয়ে এসো। তবে এ মতটি খুবই দুর্বল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

"আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাক্ষীগণকে/সাহায্যকারীদেরকে (সাহায্যের জন্য) ডাকো; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়।"

ব্যাখ্যা: ফাররা ও বগভী (রাহিমাহুল্লাহ) এখানে شُهَدَآءَكُمْ-এর অর্থ করেছেন 'তোমাদের উপাস্যদের' অধিকাংশ মুফাস্‌সির অর্থ করেছেন 'সাহায্যকারী, সমর্থক ও সহযোগী অর্থাৎ- কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের' ডাকো। ইবনু কাসীরের প্রশ্ন- এখানে 'সাক্ষী' শব্দ কেন আনা হলো? সাক্ষী তো হলো কোনো ঘটনা দেখে সাক্ষ্য দেওয়া, এখানে তো কোনো ঘটনা ঘটেনি; বরং অনুরূপ সূরা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। মুজাহিদের ব্যাখ্যায় এর উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ناسًا يشهدون لكم অর্থাৎ- এমন লোকদের ডাকো যারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। বলবে– হ্যাঁ, তোমরা কুরআনের মতো কিছু এনেছ। তারপর মহান আল্লাহর বাণী– ﴿اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ (যদি তোমরা সত্যবাদী হও।) অর্থাৎ- সত্যবাদী হলে তোমাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিৎ। তোমরাই তো বলেছ, মুহাম্মদ নিজের পক্ষ থেকে কুরআন রচনা করেছে। রচনার জগতে তোমরা তো তাঁর চেয়েও অগ্রগামী, তাহলে তাঁর মতো করে তোমরাও এমন একটি সূরা তৈরি করে দেখাও। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন, তখন তারা সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ল। এটাই কুরআনের সবচেয়ে বড় মু'জিযাগুলোর একটি।

শিক্ষাসমূহ

এক- আল-কুরআনের অলৌকিকতা ও চ্যালেঞ্জ: কুরআন স্বয়ং মহান আল্লাহর বাণী। এতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। যারা সন্দেহ পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। পুরো কুরআন তো দূরের কথা, এর যেকোনো একটি সূরার মতো ছোট কোনো সূরা বা আয়াত রচনা করার ক্ষমতাও কোনো মানুষের নেই।

দুই- চ্যালেঞ্জ গ্রহণে মানবজাতির অক্ষমতা: আরবের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিগণ এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও এর সমকক্ষ কিছু তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে। সৃষ্টির কারও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সক্ষমতা নেই।

তিন- মহানবী (ﷺ)-এর নবুওয়াতের সত্যতা: যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কবি বা জাদুকর বলে অপবাদ দিত, এই আয়াত তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়। এটি প্রমাণ করে যে কুরআন কোনো মানুষের বানানো বাণী নয়; বরং তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর পরম সত্যতা।

চার- মহান আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ)-এর প্রমাণ: আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য সমস্ত সাহায্যকারীদের (উপাস্য, অংশীদার বা মানবীয় শক্তি) ডেকে এনে চেষ্টা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া মহাবিশ্বে আর কারো এমন ক্ষমতা নেই যা ওহীর সমকক্ষ বা সদৃশ হতে পারে।

পাঁচ- অহংকার ও হঠকারিতার পরিণতি: সত্য সুস্পষ্টভাবে সামনে আসার পরেও যারা কেবল অহংকারের বশে তা অস্বীকার করে, এই আয়াত তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিকভাবে পুরোপুরি পরাজিত করে।

দرس الحديث / দারসুল হাদীস:

মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপাচার

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

সরল বাংলা অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (মহান আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই করা কুফ্রী।[৪]

হাদীসের ব্যাখ্যা

হাদীসের প্রথম অংশে বলা হয়েছে–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ.

অর্থাৎ- কেনো মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী।

গালি মানে মন্দ কথা। যে কথা শোনার উপযোগী নয়। শুনতে খারাপ লাগে। যাকে এককথায় বলে অশ্রাব্য ভাষা। অশ্লীল ও নোংরা বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে মা-বাবা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বা বোনের নাম নিয়ে বাজে কথা বলাকে গালি বলা হয়। এটা গুনাহের কাজ। মু’মিন বান্দা কাউকে গালি দিতে পারে না। চাই সেটা যে কোনো প্রেক্ষাপটেই হোক না কেন। অধীনের কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ বা গালগপ্পে বন্ধুর আসর। কোনো অবস্থাতেই মু’মিন ব্যক্তির মুখের ভাষা অশ্লীল হতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا﴾

অর্থাৎ- “যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।”[৫]

ইসলামি শরিয়তে গালিগালাজ, অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো– গালিগালাজ, অশ্লীল কথাবার্তা বলার সময় মানুষের নৈতিকতার সীমা লংঘন হয়ে যায়। কেউ যদি কারো বাবাকে গালি দেয় তো অপরজন তার বাবা-মাসহ সবাইকে গালি দিয়ে বসে। এভাবে সীমালংঘন হয়ে যায়। যার ফলে মারামারি, ঝগড়াঝাটি ও রক্তপাতের মুখোমুখিও হয়।

নবী (ﷺ) গালি দেওয়াকে ফুসুক বলেছেন। ফুসুক শব্দের আভিধানিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াকে ফুসুক বলে।[৬] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুফতি রাফি উসমানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে মুত্তাকী বা নেককার শব্দের উল্লেখ করা হয়নি, এতে বোঝা যায়, যে কোনো শ্রেণির মুসলমানকে গালি দেওয়া জায়িয নেই।”[৭]

পক্ষান্তরে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কখনো এসব কথাবার্তায় নিজেকে জড়িত করে না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْءِ".

‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মু’মিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।[৮]

যারা অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, লোকেরা তাদের ঘৃণা করে। কেউ তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না। গালমন্দ করা অভদ্রতা ও সভ্যতার পরিপন্থী কাজ। এতে অন্য মানুষ কষ্ট পায়।

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।*

[৪] *সহীহুল বুখারী- ৪৮, ৬০৪৪; সহীহ মুসলিম- ২৩০।*

[৫] *সূরা আল-আহ্যা-ব: ৫৮।*

[৬] *ফাতহুল মুলহিম- ২/২১।*

[৭] *দরসে মুসলিম- ৪২০।*

[৮] *তিরমিযী- হা. ১৯৭৭; সহীহাহ্- ৩২০।*

আর কোনো মানুষকে কথা বা কাজ দ্বারা কষ্ট দেওয়াও নিষিদ্ধ। হাদীসে নবী (ﷺ) এ ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন এভাবে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ.

প্রকৃত মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপাদ থাকে।[৯]

মনে রাখতে হবে নবী (ﷺ) আমাদের আদর্শ। তিনি কেমন ছিলেন। তিনি কখনো কাউকে মন্দ বা কটু কথা বলেননি। কারো প্রতি রাগ করেননি। হাদীসে এসেছে– আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) গালিগালাজকারী, অশালীনভাষী এবং অভিসম্পাতকারী ছিলেন না। আমাদের কারো উপর তিনি নারাজ হলে শুধু এটুকু বলতেন যে, তার কি হলো! তার কপাল ধুলিময় হোক।[১০]

সুতরাং মু'মিন মুসলমানের উচিত, অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা বলে কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। যে কোনো ধরনের মন্দ বা কটু কথা এবং গালিগালাজ করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

গালির শাস্তি হিসেবে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الرَّجُلُ يَسُبُّنِيْ؟ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.

ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়ে থাকে। তখন নবী করীম (ﷺ) বললেন: যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক।[১১]

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَبَّنِيْ فِيْ مَلَأٍ هُمْ أَنْقَصُ مِنِّيْ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، هَلْ عَلَيَّ فِيْ ذٰلِكَ جُنَاحٌ؟ قَالَ: اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ. قَالَ عِيَاضٌ: وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً، قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ: إِنِّيْ أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِيْنَ.

ইয়ায ইব্‌ন হিমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, পরস্পরে বিনয়ী হও, কেহ কারো সাথে বাড়াবাড়ি করিও না, একে অপরকে গর্ব প্রদর্শন করিও না। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে আমার চাইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সম্মুখে গালি দেয়, আর আমিও তার প্রত্যুত্তর করি তবে এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? এতে কি আমার পাপ হবে? তিনি বললেন, যারা একে অপরকে গালি দেয় তাদের উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং তারা উভয়েই মিথ্যুক। ইয়ায (রাঃ) বলেন, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিপক্ষ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাঁকে একটি উট হাদিয়া দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি তখন বললেন, মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণে আমার রুচি হয় না।[১২]

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে–

وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

অর্থাৎ- একজন মুসলিমের সাথে লড়াই করা কুফ্‌রী।

ইসলামে একজন মুসলিমের সাথে অন্যজন মুসলিমের লড়াই বা যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং মহাপাপ। রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هٰهُنَا». وَيُشِير إِلَى صَدره ثَلَاث مرار بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ ومالهُ وَعرضه.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: এক মুসলিম অপর মুসলিমের (দীনী) ভাই। মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিমের ওপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহভীতি এখানে! এ কথা বলে তিনি (ﷺ) নিজের বক্ষের দিকে

---

[৯] *সহীহ বুখারী।*
[১০] *সহীহ বুখারী।*
[১১] *আল-আদাবুল মুফরাদ- ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ), ৪২৮।*
[১২] *আল-আদাবুল মুফরাদ- ৪২৯।*

তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন: একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম।[১৩]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (ﷺ) أَتَاهُ رَجُلَانِ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوْا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ (ﷺ) فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِيْ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِيْ فَقَالَا أَلَمْ يَقُلْ اللهُ: (وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ): فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللهِ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়রের যুগে সৃষ্ট ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী! কী কারণে বের হন না? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা-নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দু’জন বললেন, আল্লাহ তা‘আলা কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো ততক্ষণ যাবৎ যতক্ষণ না ফিতনার অবসান ঘটে। তখন ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যাবৎ না ফিতনার অবসান ঘটেছে এবং দ্বীনও মহান আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ যেন আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের জন্য দ্বীন হয়ে গেছে।[১৪]

যদি কোনো মুসলিম অন্যায়ভাবে আরেকজন মুসলিমকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا﴾

“কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু’মিনকে হত্যা করলে, তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।”[১৫]

দু’টি মুসলিম দলের মধ্যে বিবাদ বা যুদ্ধ শুরু হলে অন্য মুসলিমদের দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যে মীমাংসা বা শান্তি-সমঝোতা করিয়ে দেওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

“নিশ্চয় মু’মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।”[১৬]

হাদীসের শিক্ষা

১. মুসলিমদের ইজ্জত ও রক্তকে সম্মান করা আবশ্যিক।
২. বিনা অধিকারে কোনো মুসলিমকে গালি দেয়ার পরিণাম গুরুতর; কারণ বিনা অধিকারে যে গালি দেয়, সে ফাসিক (পাপী)।
৩. একজন মুসলিমকে বকা দেওয়া এবং তার সাথে লড়াই করা ঈমানকে দুর্বল ও ক্ষুন্ন করে।
৪. কিছু ‘আমলকে কুফ্র বলা হয়; যদিও বড় কুফ্রী পর্যন্ত না পৌঁছায় যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়।
৫. এখানে কুফ্র দ্বারা ছোট কুফ্র উদ্দেশ্য যা আহলুস সুন্নাহদের ঐকমত্যে দীন থেকে বের করে দেয় না; কারণ আল্লাহ মু’মিনদের পরস্পর যুদ্ধ ও ঝগড়ার সময় তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানকে সাব্যস্ত করেছেন।

উপসংহার

ইসলাম বিশ্বময় চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবভ্রাতৃত্ব তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম মানবীয় ভ্রাতৃত্বের এমন এক অনুপম ধারণা পেশ করেছে যা অতুলনীয়। ইসলামি আদর্শে গালমন্দ, অশ্লীল কথা ও কটূবাক্যের স্থান নেই। তাই একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে আমাদের সব ধরনের গালাগালি, কটুক্তি ও অপরজন কষ্ট পায় এমন আচরণ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হবে। তবেই আমরা নিজেদের মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসেবে দাবি করতে পারবো।

---

[১৩] *সহীহ মুসলিম- ২৫৬৪; সহীহ আত্ তারগীব- ২৯৫৮; আহমাদ- ৭৭২৭; শু‘আবুল ঈমান- ৬৬৬০; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী- ১১৮৩০; মিশকাত- ৪৯৫৯।*

[১৪] *সহীহ বুখারী- ৪৫১৩।*

[১৫] *সূরা আন্-নিসা: ৯৩।*

[১৬] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১০।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ও মেহমানদারি

শাইখ মো. আব্দুল বারী ফরাজী*

মানব সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান পরিবার। নর-নারীর পারস্পরিক বৈধ মিলনের ফলে এ পরিবারের সৃষ্টি। এ পরিবার থেকেই একটি নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। রক্তের দিক দিয়ে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা, ফুফু প্রভৃতি এবং বৈবাহিক দিক দিয়ে সকল আপনজনই আত্মীয়। মামা মামি, মামাতো ভাই, মামাতো বোন, খালা খালু, তাদের সন্তান-সন্ততি, ফুফাতো ভাই, ফুফাতো বোন, তাদের সন্তান-সন্ততিও আত্মীয়। যাদের সঙ্গে দুধের সম্পর্ক আছে তারাও আত্মীয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেক ব্যাপক ও বহু প্রশস্ত। আত্মীয়দের সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের প্রতি সদাচরণ করা, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা সকলের প্রতি বিশেষ কর্তব্য। পিতা মাতার পরেই আত্মীয়-স্বজনের হক্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ﴾

“তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজেদের অধিকার দাবি করো। আর রক্তের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করো না।”[১]

﴿وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى﴾

(তারাই সত্যিকারের মুত্তাকী বা ধর্মপরায়ণ) “যারা আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ দান করে।”[২]

﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا﴾

“আত্মীয়-স্বজনকে তার হক্ব দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।”[৩]

﴿لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ﴾

“সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, ক্বিয়ামাত দিবসের ওপর, মালাইকা (ফেরেশ্তাদের) ওপর এবং সমস্ত নবীগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে।”[৪] আর আত্মীয়-স্বজনদের দান করা দ্বিগুণ সাওয়াব। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন:

لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

“তাদের উভয়ের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। **এক.** নিকটাত্মীয়তার সাওয়াব, **দুই.** সাদাক্বাহ্ ও দানের সাওয়াব।”[৫]

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

“আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”[৬]

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”[৭]

«لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

“আত্মীয়-স্বজনের সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়; বরং কোনো আত্মীয় যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নও করে তথাপি তার সাথে সদ্ব্যবহার করাই হলো সর্বোত্তম “ছেলায়ে রেহমী” তথা সম্পর্ক বজায় রাখা।”[৮]

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِ قَاطِعُ رَحِمٍ.

“যে জাতির মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোক থাকে সে জাতির ওপর মহান আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না।”[৯]

ভালোবাসা হৃদ্যতা বৃদ্ধির জন্য আত্মীয়-স্বজনদের সামর্থ্য অনুসারে উপহার উপঢৌকন দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا.

“তোমরা পরস্পর উপঢৌকন আদান-প্রদান করো। তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে।”[১০]

---

*বি. সি. এস. (সাধারণ শিক্ষা), আরবী প্রভাষক, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

[১] সূরা আন্-নিসা: ১।

[২] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৭৭।

[৩] সূরা বানী ইসরা-ঈল: ২৬।

[৪] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৭৭।

[৫] মুসলিম- হা. ৪৫/১০০০।

[৬] মুসলিম- হা. ১৯/২৫৫৬।

[৭] বুখারী- হা. ৬১৩৮।

[৮] বুখারী- হা. ৫৯৯১।

[৯] বায়হাক্বী- মা. শা., ৬/২২৩।

[১০] মু'আত্তা ইমাম মালিক- হা. ১৮৯৬।

এসব আত্মীয়-স্বজনগণ আমাদের প্রকৃত মেহমান বটে। তাছাড়া যেসব মুসলমান দুঃস্থ দরিদ্র তারাও আমাদের মেহমানের পর্যায়ে পড়ে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ».

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করতে পারে। আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে রত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করেন।"[২]

নবী করীম (ﷺ) আরো বলেছেন:

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে, মহান আল্লাহও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।"[৩]

অতএব আমাদের কর্তব্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং মাঝে মধ্যে এসব মেহমানদেরকে বেড়াতে আনা, যথাসাধ্য তাদের মেহমানদারী করা ও দাওয়াত করে খাওয়ানো। পর্যায়ক্রমে অপরাপর দরিদ্র অসহায় মুসলমানদেরও সাহায্য করা, দাওয়াত করে খাওয়ানো এতে যেমন আত্মীয়তার হক্ব আদায় হবে, তেমনি আল্লাহ আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন ইন্ শা-আল্লাহ। মনে রাখবেন, আপনি যখন কোনো আত্মীয় ও মেহমানের আগমনে ও তাকে দেখে খুশি হবেন তখন পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলাও আপনার ওপর খুশি হয়ে যাবেন।

এক প্রতিবেশীর প্রতি অপর প্রতিবেশীর হক্ব ও কর্তব্য

প্রতিবেশী কারা: মানুষ সমাজে তার বন্ধু-বান্ধব, মহল্লা, রোড বা প্লট অথবা গলি কিংবা পাড়ার লোক এবং গ্রামের লোকজনের সঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়ে মিলে-মিশে বসবাস করে ও কাজ-কারবার করে। ইসলামী পরিভাষায় এরা সকলেই প্রতিবেশী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

প্রতিবেশী রোগাক্রান্ত হলে তার খোঁজখবর নিবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে। যদি সে ঋণ চায় তাহলে বিনা শর্তে তাকে ঋণ দিবে। যদি সে কোনো খারাপ কাজ করে বসে তাহলে তা গোপন রাখবে। সে কোনো কিছু দ্বারা সৌভাগ্যবান হলে তাকে মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাবে। কোনো বিপদে পড়লে তার উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসবে। স্বীয় অট্টালিকা এতটুকু উঁচু করবে না যাতে তার ঘর হতে বের হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তোমার গৃহে যখন কোনো ভালো খাদ্য রান্না করো, তখন উক্ত খাদ্য যেন তাদের এবং তাদের সন্তানদের কষ্ট দান না করে অর্থাৎ- তাদেরকেও কিছু দান করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কেউ যদি তরকারি রান্না করে তাহলে সে যেন ঝোল বেশি দেয় এবং প্রতিবেশিদের নিকট পাঠিয়ে দেয়।[৪]

প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার জানাযায় শরিক হবে এবং তাকে কাফন-দাফন দিবে। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে এবং তাদের দুঃখে সমবেদনা জানাবে। সর্বোপরি, প্রতিবেশী যদি হিন্দু, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোক হয়, তাহলেও তাদের সঙ্গে সর্বদা সুন্দর ব্যবহার করবে এবং তাদের অধিকারগুলো আদায় করবে।

একদিন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র গৃহে একটি বকরী যবেহ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং গৃহবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের ইয়াহুদি প্রতিবেশীকে গোশ্ত হাদিয়া দিয়েছো কী?

মোটকথা, প্রতিবেশী মুসলমান, অমুসলমান বা আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় যে কোনো শ্রেণীর হোক না কেন, যার যতটুকু অধিকার ও হক্ব রয়েছে ততটুকু আদায় করা অবশ্যই কর্তব্য। যে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে সে মু'মিন নয়; সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, সে জান্নাতে যাবে না। যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে প্রকৃত ঈমানদার নয়।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের মাঝে মানবিক গুনাবলি জাগ্রত করতে হবে। মানবিক হতে হবে। আমরা মাটির তৈরি আদম সন্তান আবার মাটিতেই মিশে যাব তাহলে মানুষের মানুষে দূরত্ব কমে যাবে। পৃথিবীটা শান্তিময় হয়ে যাবে। কবির ভাষায়:

কোথাও স্বর্গ কোথাও নরক, কে বলেছে বহুদূর
মানুষেতে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরা সুর।[৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সাবাইকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

---

[১] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১০।*
[২] *বুখারী- হা. ২৪৪২, ৬৯৫১।*
[৩] *মুসলিম- হা. ৩৮/২৬৯৯।*
[৪] *তাবরানী।*
[৫] *কবি শেখ ফজলুল করিম।*

التربيةوالحضارة / শিক্ষা ও সভ্যতা

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[দ্বিতীয় পর্ব]

ন্যায়বিচার, সদাচার এবং স্বজনদের দান করার নির্দেশিকা একটি সভ্য সমাজের রূপরেখা আমাদের সামনে তুলে ধরে। কুরআনুল কারীমে বিঘোষিত হয়েছে–

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচার, সদাচার এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।"[1]

দান-সাদাক্বার মাধ্যমে সম্পদের পবিত্রকরণ ও নিজের সুরক্ষার আয়োজন ইসলামের একটি প্রশংসিত বিধান। হায়াত দীর্ঘায়িত করতে চাও, স্বজনদের ভালোবাসো, কাছে টেনে নাও ও দান করো"– নবীজির বাচনিক এ সকল উদ্ধৃতিতে একটি সুবাসিত সমাজ বিনির্মাণের চাবিকাঠি।

ইসলামে বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি পারলৌকিক উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব দেয়। কুরআন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাত-উভয়ক্ষেত্রেই কল্যাণ কামনা করতে শিক্ষা দেয়। পরকালীন জীবনের অনন্তকালের কল্যাণ ও পার্থিব জীবনের কল্যাণ কামনা করতে পরওয়ারদিগার আমাদের শিখিয়েছেন– "হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।" উভয় জীবনে কল্যাণ কিন্তু সভ্যতার অংশ। পরলোকে কল্যাণ পাবার উপায় হচ্ছে ইহকালে খোদাওন্দ কুদ্দুসের আরাধনা ও তার প্রেরিত বিধি-বিধানে ও নবীর তরীকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এর ফলে একটা সুশীলসমাজের চিত্র আমরা দেখতে পাই। আলস্য কিংবা নিঃশ্চেষ্টতা একটা ভঙ্গুর ভোগবাদী সমাজের ইঙ্গিত বহন করে। সেখান থেকে রক্ষা পাবার জন্য "চেষ্টা ছাড়া মানুষ কিছু পেতে পারে না" আয়াতে মানুষকে কর্মপ্রবন হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ইসলামে বৈরাগ্যবাদী জীবন ব্যবস্থাকে (রাহবানিয়াত) পরিহার করতে বলেছে। পার্থিব জীবন, পরিবার-পরিজন, বৈধ ভোগ-বিলাস ও সামাজিক দায়িত্ব ত্যাগ করে নির্জনে থেকে কোনো ইবাদতে আত্মনিয়োগের মতো ভ্রান্ত ধারনা আজ মানুষকে পেয়ে বসেছে। অথচ কুরআন মাজীদে উক্ত হয়েছে–

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾

"আর সন্ন্যাসবাদ (রাহবানিয়াত)- তারা নিজেরাই তা উদ্ভাবন করেছিল; আমি তা তাদের উপর ফর্য করিনি।"[2]

ইসলামে রাহবানিয়াতকে আদর্শজীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। ইসলাম ইবাদত ও দুনিয়ার দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিক্ষা দেয়। তাই বিবাহ, জীবিকা-অর্জন, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়েছে। আর এই ঐশীধারা অনুশীলনের মাধ্যমে একটি টেকসই সভ্যতার দেখা মেলে। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, ইসলামি সৃষ্ট সভ্যতা একপাক্ষিক নয়; বরং পার্থিব উন্নতি ও নৈতিক-আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমন্বিত এক বৈজ্ঞানিক রূপ।

ইসলামি সভ্যতা বিকাশের ক্রমধারা: ইসলামি সভ্যতা বিকাশে ওয়াহদানিয়াতের চেতনা মূল চাবি-কাঠি। ওয়াহদানিয়াত অর্থ মহান আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানুষের চিন্তা, চরিত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় এবং শান্তি, সাম্য ও মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আদর্শ ও টেকসই সভ্যতা বিনির্মাণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টির প্রথম মানব ও মানবী স্রষ্টার নির্বাচিত যুগল। পুরস্কার ও তিরস্কারের কাঠামোর আওতায় ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তারা জান্নাত থেকে দুনিয়ার জীবনে প্রেরিত হন। বংশবৃদ্ধির ধারা বাহিকতায় তারা গড়ে তুলেন সমাজ। ভুল বোঝাবুঝির নিত্যপ্রক্রিয়ায় সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সত্য চিরন্তন। চড়াই-উৎরায় পেরিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

[1] সূরা আন্-নাহ্ল: ৯০।

[2] সূরা আল-হাদীদ: ২৭।

সূচীপত্র

ওয়াহদানিয়াতের ধারণা বিকাশে নবী-রাসূলগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাবিলের নির্মমতায় হাবিলের জীবনহানি সত্ত্বেও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালান্তরে মুসলিম জাতির পিতা ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর ভূমিকা বহুশ্বরবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত হানে। স্বমহিমায় তাঁর নেতৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তাওহীদি চেতনা। কষ্টদায়ক জীবনকে পরিগ্রহণ করে আইউব, ইউনুস ও জাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) অবিচল থেকেছেন। তাদের ঈমানী দীপ্ততায় কালো ছায়া কখনো নিপতিত হয়নি। সমাজের সমস্ত মানুষকে রক্ষার স্বার্থে বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন ইউনুস (আলায়হিস সালাম)। মহান আল্লাহর একত্বকে সমুন্নত রাখার অভিপ্রায় জাকারিয়া (আলায়হিস সালাম)-কে করাতে জীবন বিদীর্ণ হতে দেখা গেছে। কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েও ইউসুফ (আলায়হিস সালাম) রাজরাণীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেননি। সর্বশেষ নবিরও অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, তিনি লোভাতুর জীবনকে পদাঘাত করে অবিচল থাকতে পিছুপা হননি। 'সবচেয়ে সুন্দরী রমনী ও সমগ্র আরবের রাজাধিরাজ বনে যাওয়ার হাতছানি' মুহাম্মদ (ﷺ)-কে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এইভাবে তাওহীদভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা, মানব মর্যাদা ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় সহনশীলতা ও নৈতিকতার স্তম্ভে বিনির্মিত হয় সভ্যতা।

বস্তুতঃ ইসলামি সভ্যতা মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী ও সুদীর্ঘস্থায়ী সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠে ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিতে। তাওহীদভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার আলোয় আলোকিত মহানবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাবের পর এটি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। অল্প কয়েক শতাব্দির মধ্যে ইসলামি সভ্যতা আরব উপদ্বীপ থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গণিত, দর্শন ও শিল্পকলায় সভ্যতার বিকাশে অসামান্য ভূমিকা রাখে।

সৃষ্টির শুরু থেকে সভ্যতার উন্মেষ বিকাশের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের কালচক্রে সভ্যতার পতনও ঘটেছে। আজ থেকে দেড়হাজার বছর আগে নতুন আঙ্গিকে আমরা আরো একটি সভ্যতার সাথে পরিচিত হই। সেটি হলো ইসলামি সভ্যতা, তাওহীদ বিজ্ঞানের আলোয় বিভাসিত এই সভ্যতা নতুন কিছু নয়; তবে এতে নবতর ব্যাঞ্জনা আছে। পূর্ণতার লক্ষ্যে এটিও একটি যাত্রা বিবেচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে আখেরী নবির হাতে পরিশীলিত উপায়ে মনুষ্য সমাজে সভ্যতা উপহৃত হয়। মক্কা পর্বে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) পুনর্বার তাওহীদ, নৈতিকতা, মানব মর্যাদা ও ন্যায় বিচারের শিক্ষা দেন। এটি কিন্তু হাল 'আমলের সভ্যতাকেন্দ্রিক নিদান নয়; বরং সৃষ্টির শুরু থেকেই ওই সব শিক্ষার চর্চা হয়ে এসেছে।

প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে পুড়ে যাওয়া একটি প্যাপিরাস স্ক্রলের লেখায় নৈতিকতা, শিক্ষা ও মানুষের আচরণের আলোচনা এসেছে। বিষয়গুলো স্টোয়িক দর্শনের বিষয়ীভূত। এতে 'হরমে' বা মানুষের অন্তর্গত তাড়না এবং ফ্রোনেসিস বা বাস্তবজ্ঞান নিয়ে আলোচনা আছে। কুরআনুল কারীমে এ সকল আলোচিত বিষয়। যে কোনো সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে মানুষের নৈতিকতা, অন্তর্গত তাড়না ও বাস্তবজ্ঞান চর্চার অপরিহার্যতা লক্ষ্য করা গেছে। কুরআনুল কারীমে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয় (সত্যবাদিতা, ন্যায় বিচার, আমানত, দয়া, তাক্বওয়া, সৎকর্ম ইত্যাদি) অন্তত হাজারেরও বেশি আয়াতে আলোচনা হয়েছে। মানুষের অন্তর্গত তাড়নার (নফস, প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা) বিষয় কুরআনুল কারীমে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নফস শব্দটি ২৯৫ বার পবিত্র কুরআনে এসেছে। এছাড়া হাওয়া (কুপ্রবৃত্তি/খেয়ালখুশি), শাহওয়াহ্ (কামনা) ইত্যাদিও বাদ পড়েনি। মানুষের বাস্তবজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির শুদ্ধতায় আকল ৪৯ বার, ইল্‌ম (জ্ঞান) ৮৫০ বার এবং হিকমাহ্ (প্রজ্ঞা) অন্ততঃ ২০ বার আলোচনায় এসেছে। নবীর জন্মের অন্ততঃ হাজার বছর আগে চর্চিত এসব বিষয়ের মাধ্যমে সভ্যতার অধিষ্ঠান ওহীর সূত্রকে সমর্থন যোগায়।

মহানবির হিজরতের পর (৬২২ খ্রি.) তিনি একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্টোয়িক দর্শনে বিধৃত মদিনার শেকেলে ধর্মীয় স্বাধীনতা, আইনের শাসন, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের বাস্তবায়ন ঘটে। মানবমণ্ডলীকে একসূত্রে গাঁথার অভিপ্রায়ে মদিনার সনদ প্রকাশ করেন। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত রাষ্ট্রচুক্তিগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। এটিই ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সভ্যতার সাংবিধানিক ভিত্তি স্থাপন করে।

২২ বছরের পর্ব শেষে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অবারিত হয় (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)। চার খলিফার শাসনামলে ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে নিবিড় পরিচর্যা ও অনুধাবন সমাজে ট্রান্সপারেন্সির আবহ সৃষ্টি হয়। বিশ্বাস, আস্থা ও ভক্তির সমাহারে সারাদেশে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা ও স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বায়তুল মালের উন্নয়ন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঐশ্বরিক চেতনার মর্মমূলে মানবসমাজকে কাছাকাছি করে তোলে। গড়ে উঠে ঐশী বার্তার আদলে, 'তোমরা মহান আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে ধরো, পরস্পরে পৃথক হয়ো না'। আর এই আপ্তবাক্যতেই ইসলামি সভ্যতার নৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

আড়াই যুগ পূর্ণতার বছর খানেক আগেই মহান খলিফা 'আলীর শাহাদতের পরে (৬৬১ খ্রি.) 'উমাইয়াহ্ যুগের সূচনা ইসলামি সভ্যতার বিকাশে নতুন মোড় নেয়। পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে সিন্ধু পর্যন্ত 'উমাইয়াহ্ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। প্রয়োজনের নিরীখে বিবিধ সংস্কার, নগরায়ন, সড়ক নির্মাণ, ডাক ব্যবস্থা ও মুদ্রা সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্র আরো শক্তিশালী হয়। এই সময় আরবি ভাষা প্রশাসনের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠে।

সুন্নাতাল্লাহ ও নবীর দেখানো পথ অনুসরণ করে পল্লবিত হয়ে উঠে ইসলামি সভ্যতা। নব্বই বছরের ব্যবধানে 'আব্বাসীয় যুগে পদার্পণ একটি মাইল ফলক। এযুগকে ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। খলিফা আল মামুনের আগ্রহাতিশয্যে রাজধানী বাগদাদ বিশ্বজ্ঞান ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। গ্রিক, ভারতীয় ও পারস্যের মূল্যবান গ্রন্থরাজি আরবিতে অনূদিত হয়। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়নশাস্ত্র, দর্শন ও ভূগোলে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। গ্রিক অঙ্কশাস্ত্র চর্চা করে বীজগণিতের উদ্ভাবন মুহাম্মদ ইবনু মূসা আল খোয়ারিজমীর অসামান্য কীর্তি। ইবনু সিনা, ইবনুল হায়সাম, আল বিরুনী, জাবির ইবনু হায়য়ান প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান, আলোক বিজ্ঞান, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাদের গবেষণা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় নবজাগরণ ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে গভীর প্রভাব ফেলে।

'উমাইয়াদের পতনের ফলে ইসলামি সভ্যতা দ্বিগুনাকারে বিকশিত হয়। একদিকে 'আব্বাসীয় খলিফাদের নেতৃত্বে বাগদাদকেন্দ্রিক অন্যদিকে 'উমাইয়াদের নেতৃত্বে স্পেন কেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা অব্যাহত থাকে। স্পেন অচিরেই মধ্যযুগীয় ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠে। কর্ডোবা, সেভিল, গ্রানাডা, মালাগা, টলেডোতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মানমন্দির ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে চিকিৎসা, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা করতো। আরবি ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপীয় নগজাগরণের সূত্রপাত করে।

পরবর্তীতে বাগদাদ ধ্বংস ও স্পেনের পতন সত্ত্বেও ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়নি। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উসমানীয় সাম্রাজ্য ইসলামি সভ্যতার রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। প্রশাসন, সামরিক সংগঠন, স্থাপত্য, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থায় তারা উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করে। ইস্তাম্বুল জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল সেতু জনকল্যাণমূলক স্থাপনা উসমানীয়দের সময়ও অব্যাহত ছিল। 'আব্বাসীয় শাসনামলের মাঝামাঝি পর্যায়ে বিভক্ত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্যসমূহে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল।

ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় ইসলামি সভ্যতার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। গত আটশত বছরে ইসলামি রাস্ট্রসমূহ তাওহীদভিত্তিক বিশ্বদৃষ্টি, জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি উৎসাহের সূচনাই হয়নি কাঠামোগতভাবে এগিয়ে যায়। ন্যায় বিচার ও মানব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও বহুসাংস্কৃতিক সহাবস্থান সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ টয়েনবি (১৯৫৭), হিট্টি (১৯৫৮), হজনসন (১৯৭৭), বেক (১৯৯৪) ও লুইস (১৯৯৫) প্রমুখের অভিমত কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উন্নয়নে ইসলাম একটি উৎক্ষেপক কৌশলের (Trigger Machanism) ভূমিকা পালন করেছিল।

ذكريات / স্মৃতিচারণ

স্মৃতির বাতায়নে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)

ডা. সুলতান আহমদ*

এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালে জমঈয়ত সংগঠনটি পৃথিবীর আলোর মুখ দেখে। তার মূলে ছিলেন শ্রেষ্ঠ সংগঠক, ধৈর্যশীল, বাগ্মী, ত্যাগী, নিবেদিত সংগঠক, তাওহীদী জনতার একমাত্র আলোকবর্তিকা, চিরকুমার, মেঠো পথ দিয়ে চলা এবং পাড়ায় ও গ্রামে দা'ওয়াতী কাজে সদায় ব্রত থাকা শ্রেষ্ঠ বীরসেনানী আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাইশী (রহ্.) তিনিই এই মহতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অসামান্য অবদান কখনও ভুলব না। ১৯৬০ সালের ৪ জুন তিনি মায়াবী জগত ছেড়ে মহান আল্লাহর কাছে চলে যান।

তাঁর ভাতিজা জ্ঞানতাপস, প্রজ্ঞাময়ী জীবন, যাদুকরী কণ্ঠ, উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাণ্ডারী হিসেবে সংগঠনের দায়িত্বে দ্বিতীয়বার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেখানেই আহলে হাদীসদের আবাসন, সেইখানেই চলে তাঁর দা'ওয়াতী কাজ। প্রতিষ্ঠা করেন অনেক দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লোক তৈরি করতে না পারলে সংগঠন মজবুত হবে না। পরবর্তী সময়ে শ্রদ্ধেয় স্যারের পৃষ্ঠপোশকতায় অসংখ্য জ্ঞানী, গুনী, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে এ মহতি সংগঠনে।

স্যারকে প্রথম দেখি রাজশাহীর রাণী বাজার মাদ্‌রাসার কার্যকরী কমিটির সভায়। ভাবা যায়! কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি হয়ে একমাত্র সংগঠনের স্বার্থে একটি মাদ্‌রাসার সভায় জ্ঞান বিতরণে এবং দিক-নির্দেশনায় মশগুল। সে সভাতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আর একটি নক্ষত্র প্রফেসর আয়েশ উদ্দীন স্যার। স্যারের ছাত্র হওয়ায় তিনি সম্মানিত সভাপতি স্যারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন আমাকে তিনি বেটা বলে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তোমার স্যারের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে, জমঈয়তের বেশি বেশি কাজ করবে। শ্রদ্ধেয় স্যারের এই সংক্ষেপ কথায় আমি যেন এক মোহচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। সেদিন থেকে জমঈয়ত ছাড়া আর কোনো দিকে ফিরে তাকাইনি। পথ চলা শুরু জমঈয়ত সংগঠনে।

১৯৯০, উপ-পরিচালক পদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নওগাঁ জেলায় কর্মরত। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জেলা জমঈয়ত সভাপতি মো. শামসুল হক-কে নিয়ে স্থানীয় সুধীদের আন্তরিক সহযোগিতায় ৮ক দেব পাড়ার শাইখ মীর আব্দুস সালামের নির্মিত মসজিদ ভেঙ্গে বড় করে দ্বিতল মসজিদ করা হয়। মাদ্‌রাসার জায়গা নির্ধারণ করা হয়। সংগঠন গতিশীল হতে থাকে।

নওগাঁ জেলার নওজোয়ান মাঠে কনফারেন্সের জন্য বিশাল প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়। প্রফেসর ডক্টর আব্দুল বারী স্যার প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদ্বয় প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম ও শাইখ আবু তাহের বর্দ্ধমানী উপস্থিত থেকে জমঈয়তকে উজ্জিবিত ও প্রাণবন্ত করে তুলেন।

আমার কর্মতৎপরতায় স্যার মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, তুমি যেখানে যাবে বেটা সেখানেই সফল কনফারেন্স উপহার দিবে। আমি বলেছিলাম, স্যার দু'আ করবেন।

১৯৯২, নাটোর জেলায় কর্মরত। প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার ও শাইখ আবু তাহের বর্দ্ধমানী মহোদয়গণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় জেলা কনফারেন্স। বাবুর্চী না পাওয়ায় পাঁচশত লোকের সকাল ও দুপুরের রান্না আমি নিজেই করি। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই হতভম্ব হয়ে যান। বাদ যোহর শুরু হয় কনফারেন্স। স্যারের অমীয় বাণীতে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যান। সংগঠন হয়ে উঠে গতিশীল। স্যারকে রেখেছিলাম সার্কিট হাউজের V.V.I.P রুমে। স্যার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন, বেটা নাটোরকে তুমি গোছাতে পারবে। তুমি একটু চেষ্টা করবে। স্যার! আপনার শুধু দু'আ চাই।

৬ষ্ঠ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে যাত্রাবাড়িতে। নাটোর জেলা জমঈয়তের এ উপলক্ষ্যে শুকলপট্টি আহলে হাদীস জামে মসজিদে চলছে প্রস্তুতিমূলক সভা। তখন জেলা সভাপতি ছিলেন মসিন্দা মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য ও বিনয়ী অধ্যক্ষ শাইখ মো. মাজ্‌হারুল ইসলাম। তিনি সভায় ব্যক্ত করেন যে, কনফারেন্সে আমাদের পক্ষ থেকে কথা বলবেন উপ-পরিচালক সুলতান আহমদ।

* *সভাপতি, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।*

আমরা কনফারেন্সে উপস্থিত। প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার বক্তব্য দিচ্ছেন কান্নাজড়িত কণ্ঠে। দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি এক পর্যায়ে বলতে লাগলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংগঠন করতে গিয়ে ঘরবাড়ি কিছুই করতে পারিনি। সেনাবাহিনী একটু জায়গা দিয়েছে তা-ও হাতছাড়ার মতো। বাড়ি থেকে ঘোর আপত্তি। আর নয়...। আপনারা দয়া করে নতুন একজনকে সভাপতি করুন। আমিই দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিলাম, শেষ সূর্য অস্তমিত পর্যন্ত আপনাকেই চাই। বললেন, বেটা ওভাবে বলো না। তিনি অনবরত কাঁদছেন আর বলছেন তার পারিবারিক জটিল সমস্যাগুলো। আবারও বললাম, আমরা আপনাকেই চাই। আপনাকেই থাকতে হবে। কোনো বিকল্প নয়। তখন সভা থেকে সকলেই আমার দাবীকে সমর্থন করেন। এক পর্যায়ে স্যার বললেন, আচ্ছা, আমি সম্মতি দিলাম। তখনও তিনি কাঁদছিলেন। কান্নার কারণ হলো– তাঁর হাতে গড়া আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের বেঈমানী আচরণ।

১৯৯৩, তখনও নাটোরে আমি। পক্ষকালব্যাপী চলছে সীরাতুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে নানান অনুষ্ঠান। সেমিনারে উপস্থিত হন প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার, প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম এবং শাইখ আবু তাহের বর্দ্ধমানী। অনুষ্ঠান শেষে স্যার আমার ব্যাপারে অর্ধ পৃষ্ঠায় স্মরণীয় অভিমত স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। আমি স্যারের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও মসিন্দা মাদ্‌রাসার সেক্রেটারি ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে অধ্যক্ষ মো. মাজহারুল ইসলামকে বিতাড়িত করে সেক্রেটারি নিজেই অধ্যক্ষ হওয়ার ঘোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে। অধ্যক্ষ মাজহার সাহেব আমার অফিসে এসে ষড়যন্ত্রের সব কথা বেদনার সাথে ব্যক্ত করেন। আমি তাঁকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেই এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আজ রাতেই ঢাকা কোচ ধরে সভাপতি মহোদয়ের কাছে যাব ইন্‌শা-আল্লাহ।

কথা যা, কাজও তা। সকাল ৮টায় স্যারের বাসায় উপস্থিত। ধানমণ্ডির মঞ্জুরী কমিশনের বাসায়। স্যার তখন বাংলোর অফিসে কর্মরত। আমার আগমনের কারণ জানতে চাইলে মাদ্‌রাসার সমস্যা তুলে ধরি। স্যার আমার কথা শুনে সিংহের মতো গর্জে উঠেন। আমি হতভম্ব হয়ে যায়। স্যার তাৎক্ষণিকভাবে ল্যান্ড ফোনে জেলা প্রশাসককে ভদ্র ভাষায় শাসিয়ে দিলেন এবং বলেন মাদ্‌রাসার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। মাদ্‌রাসা কেমন চলছে আমাকে তুমি জানাবে। জেলা প্রশাসকের বাড়িও ছিল পারবতীপুরে। এরপর মসিন্দা মাদ্‌রাসা নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়।

১৯৯৪, নওগাঁ জেলায় আবারও কনফারেন্স। শ্রদ্ধেয় স্যার তখনও উপস্থিত থেকে আমাদেরকে উজ্জিবিত করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় সভাতে বা কোনো কাজে ঢাকায় এলে নবাবপুর জমঈয়ত অফিসে রাত যাপন করতাম। শাইখ আবু তাহের বর্দ্ধমানী মহোদয়ের কাছেও ঐতিহ্যবাহী বংশাল মসজিদে থাকতাম। একদিন সকাল বেলায় নিবেদিত প্রাণ অফিস সেক্রেটারি শাইখ রফিকুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি জানান যে, সভাপতি স্যার লাইব্রেরীতে আছেন। স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করি। স্যার আলমারী খুলে খুলে তাঁর বইগুলো দেখছেন। এক পর্যায়ে স্যারের অনুমতি নিয়ে বললাম, স্যার! আপনার এত বই! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জ্ঞানের সমুদ্র বানিয়েছেন। সে হিসেবে তো আমরা আপনার মহামূল্যবান লিখনী থেকে বঞ্চিত হচ্ছি স্যার। দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে মহান আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন স্যার। আমার কথা শুনে বই দেখা বন্ধ করে চোখ লাল করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সময় দিচ্ছো কই? বিনয়ের সাথে আবারও বললাম, স্যার! তবুও এর মাঝে কিছু স্মৃতি রেখে যেতে হবে স্যার। স্যারের আলমারীর বইগুলো কালের নীরব স্বাক্ষী আজ।

১৯৯৬, গাজীপুর জেলায় কর্মরত। সীরাতুন্নবী (ﷺ) অনুষ্ঠান ধানগবেষণার মিলনায়তনে। প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার প্রধান অতিথি। আহলে হাদীসের লোকজনের আনন্দের শেষ নেই। মিলনায়তনে ধান গবেষণার কর্মকর্তাসহ সুধীজনে ভর্তি। স্যারকে পেয়ে সকলেই উৎফুল্ল। স্যারের বক্তব্য যেন এক একটা মুক্তার মালা, মনমুগ্ধ হয়ে শুনছেন সব। স্যার যাবার সময় বললেন, বেটা তোমার অনুষ্ঠানে আসাতে আসাদুল্লাহ আল-গালিব কুচ্ছা রটাচ্ছে। বললাম, স্যার! তাকেও তো আমি রাজশাহীর অনুষ্ঠানে নিয়েছিলাম। তিনি তখন জোহা হলের প্রভোস্ট ছিলেন। আমার কাছে সেই অনুষ্ঠানেরও ছবি আছে। সেই ছবি স্যারের কাছে হস্তান্তর করি।

২০০২, জয়পুরহাটে ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ জুন পর্যন্ত কর্মরত ছিলাম। সেখানে বানিয়াপাড়া মাদ্‌রাসাতে অধ্যক্ষ পদে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। আমার একক নেতৃত্বে

এবং জেলা জমঈয়তের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কনফারেন্স। স্থান- বানিয়াপাড়া জামে মসজিদের পেছনে। আমাদের সর্বোত্তম কাণ্ডারী প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের আগমনে সব আয়োজন শেষ এবং গোছানোও। তৎকালীন জেলা সভাপতি মো. নূরুল হক মণ্ডলের বাড়িতে স্যারের সৌজন্যে মধ্যাহ্নের ব্যবস্থা। মণ্ডল সাহেবের সাথে একটা বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে আমি আমার অফিসে চলে আসি। স্যার খাবার টেবিলে বসে আমার খোঁজ করলে মণ্ডল সাহেব বারবার ল্যান্ডফোনে সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। বিলম্ব দেখে স্যার নিজেই ফোনে বলেন, বেটা তুমি কোথায়? স্যার! অফিসে আছি। তুমি না এলে বেটা আমি খাবো না। এ কথার পর আর কোনো আপত্তি থাকে না। স্যারের কাছে গেলাম এবং একসাথে খানা খেলাম।

কনফারেন্সে সুধীজনদের খাওয়ার মান ও শৃঙ্খলা দেখে স্যার বলেন যে, তুমি এতকিছু কি করে পার? বললাম, স্যার! কাজ পছন্দ করি। পরিকল্পনা গ্রহণ করি। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করি। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক শতভাগ সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। সকলের সহযোগিতায় ধন্য স্যার।

এক সময় প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বেশ ব্যস্ত। একদিন ফোন করলাম স্যারকে। স্যার বললেন, দু'আ করো বেটা, আগামীকাল মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে যাবো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদনের জন্য। তিনি আমার বিশ্বস্থ বন্ধু। আমি আশাবাদী যে, অনুমোদন হয়ে যাবে। আল-হামদুলিল্লাহ। স্যারের কষ্টের বিনিময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু স্যারের সাজানো স্বপ্ন একটি মহলের কারণে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

১৯৯৬, গাজীপুরে কর্মরত থাকাকালে প্রায়শই স্যারের কাছে যেতাম। স্যারের সহধর্মিনীর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয়বারের মতো অঝোরে কাঁদতে দেখেছি। মাঝে মধ্যে সহধর্মিনীর হাজারও গুনের কথা বলছিলেন আর কাঁদতেছিলেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, স্যারকে তখন সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাইনি।

নবাবপুরের অফিসে স্যারের সাথে বসা। স্যার বললেন, বেটা 'চল'। বাইপাইলে জমঈয়তের জায়গা কিনেছি। জায়গা দখলের উপক্রম, তাছাড়া আমার নামে নাকি জমি কিনেছি! এ রকম গুজব শোনা যাচ্ছে। অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ও করতে পারলাম না। পারব কি-না জানি না বেটা!

কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা থাকায় স্যারের সাথে যেতে পারিনি, তাই অপরাধী মনে হয় নিজেকে।

কোনো এক জেলার সভাপতির বাড়িতে প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের সফর সঙ্গীসহ খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। সে সময় স্যার শিশু বেলার স্মৃতি রমন্থন করে বললেন, বেটা সুলতান! শোন, আমি ফড়িংয়ের পায়ে সুতা বেঁধে মজা করছি; এমন সময় চাচাজানসহ বাপুজী দুপুরের খানা খেতে বসলেন। আমাকে ছাড়া তারা কোনো দিন খাননি। বাপুজী বললেন, আজ তোমাকে খেতে ডাকব না। আমরা শুধু দু'ভাই-ই খাবো। তুমি শুধু দেখবে। ঠিকই বাপ-চাচা খাচ্ছেন, আর আমি দেখছি, আর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বাপুজী খাওয়ার পর বললেন, তোমাকে না ডাকাতে খুব কষ্ট পেয়েছো তাই নাহ্! এ রকমই কষ্ট পাচ্ছে ফড়িংটাও। তার সন্তান আছে, পরিবার আছে, তুমি তাকে নিয়ে মজা করছো, আর সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। সেদিন থেকে আমি কোনো জীবকে কষ্ট দেইনি। আর এক জায়গায় স্যার বললেন, ফজরের আযান হলে বাপুজী ওযূ করে ঘাড়ে গামছা নিয়ে খুব মিষ্টি সুরে আ. বারী ও আ. বারী, বাবা ওঠো, ফজরের আযান হয়েছে, ওযূ করো বাবা। আমি তোমার জন্য ওযূর পানি ও গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাবা ওঠো। সে সময় ওযূ করে বাপুর সাথে মসজিদে নামাযে যেতাম।

পারিবারিক শিক্ষাই একজন সন্তানকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে পারে। তাই প্রতিটি পরিবারে এমনটাই হওয়া উচিৎ।

স্যারকে এক সময় নবাবপুর অফিসে বললাম, "সাপ্তাহিক আরাফাত", "মাসিক মদীনা" পত্রিকার মতো হলে আকর্ষণীয় হতো। স্যার বললেন, তুমি সাংবাদিক ছিলে তো, তাই তোমার এত আগ্রহ। আমরা পুরাতন সেটাপে আছি। ভাড়া জায়গা। নিজস্ব জায়গায় যখন আমরা যাবো, নতুন করে প্রেস এবং জনবল সেটাপ হবে তখন তোমার আশা পূরণ হবে বেটা। বর্তমানে "সাপ্তাহিক আরাফাত" নতুন আঙ্গিকে পাঠকের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। স্বপ্ন পূরণ হয়েছে শ্রদ্ধেয় স্যারের। হে আল্লাহ তা'আলা! স্যারকে জান্নাতুল ফেরদৌশ দান করুন –আমীন।

قصص الحديث / ক্বাসাসুল হাদীস

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে বৃদ্ধা নারীর জান্নাত

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক বেদুইন (গ্রাম্য ব্যক্তি) রাসূল (ﷺ)-এর নিকটে আসে। তিনি সেই বেদুইনকে সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, তুমি আমাদের কাছে এগিয়ে আসো। রাসূল (ﷺ) বললেন, এবার তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে বলো।

বেদুইন বলল, আমাকে একটি উট দান করুন; যাতে আমি আরোহন করতে পারি। আর একটি বকরি দান করুন যাতে আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য দুধ দোহন করতে পারি। এ দু'টি জিনিস আমি আপনার কাছে চাচ্ছি।

রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা সেই বৃদ্ধা নারীর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারলে না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! বৃদ্ধা নারীর কি ঘটনা?

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঘটনা বর্ণনা করলেন।

যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বানী ইস্রাঈলদের নিয়ে মিশর ত্যাগ করছিলেন, তখন তারা পথ হারিয়ে অন্য পথে চলে যান। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, কি ব্যাপার আমাদের পথহারা হয়ে এভাবে ঘুরে বেড়ানোর রহস্যটা কি? ইয়াহুদি ধর্মবেত্তাগণ বললেন, ইউসুফের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবার কারণে। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মহান আল্লাহর শপথ করে আমাদের থেকে এই অঙ্গিকার নিয়ে ছিলেন, 'আমরা যেন তাঁর মৃতদেহ মিশর থেকে বের করে নিয়ে অন্যত্র দাফন করি'।

মূসা (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর সমাধির সন্ধান কে জানে?

তারা বলল, বানী ইস্রাঈলের এক বৃদ্ধা নারী এ সম্পর্কে জ্ঞাত। এক ব্যক্তিকে ঐ বৃদ্ধার কাছে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা হলো।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে বৃদ্ধা! তুমি নবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সমাধী সম্পর্কে আমাদের জানাও।

বৃদ্ধা বলল, তাহলে আপনার কাছে আমার একটি আবদার রয়েছে।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার এমন কি আবদার রয়েছে? বৃদ্ধা বলল, আমি আপনার সাথে জান্নাতে বসবাস করতে চাই।

মূসা (আলাইহিস সালাম) এ ধরনের অবকাশ প্রদানে দ্বিধাবোধ করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বৃদ্ধার দাবী মেনে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

মূসা (আলাইহিস সালাম) সম্মতি প্রকাশ করলে বৃদ্ধা তাদের একটি ছোট লেকের জলাবদ্ধ পানির কাছে নিয়ে গেল এবং বলল, তোমরা এই পানি স্থানান্তরিত করে ফেলে দাও। তারা তাই করল।

এবার খনন কার্য পরিচালনা করে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র দেহ বের করো। অনুসন্ধান করে যখন তারা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র দেহ বের করল তখন দিনের আলোর মতো তাদের সম্মুখে যাত্রাপথ উন্মুক্ত হলো।[১]

শিক্ষণীয় বিষয়

০১. একজন মুসলিমের কৃত শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। অবশ্য যে শর্ত হালালকে হারাম, হারামকে হালালে পরিণত করে তা পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য।

০২. সৎ ব্যক্তিদের কাছ থেকে দু'আ কামনা করা মুস্তাহাব। আর নবীদের থেকে আখিরাতের সাওয়াবের দু'আ কামনা করা তো পরমসৌভাগ্যের বিষয়।

০৩. পার্থিব সম্পদের জন্য সীমাতিরিক্ত লোভ করা কারো জন্যই উচিত নয়।

০৪. ওয়াদা বা অঙ্গিকার পূর্ণ করা আবশ্যক। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, যার আমানতদারীতা নেই সে পরিপূর্ণ মু'মিন না এবং যার অঙ্গীকার রক্ষার গুণ নেই সেও পরিপূর্ণ দ্বিনদার না।[২]

০৫. সৎ ব্যক্তিদের সৎ ব্যক্তিদের পাশে দাফন করা মুস্তাহাব।

০৬. মৃত ব্যক্তিকে এক সমাধি হতে অন্য সমাধিতে স্থানান্তর করা জায়িয।

---

[১] *আল মুস্তাদরাক হাকীম- হা. ৪০৮৮; মুসনাদে আবি ইয়ালা- হা. ৭২৫৪।*

[২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২৩৮৩, ১২৫৬৭, শাইখ আরনাউত (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি হাসান বলেছেন; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ১৯৪।*

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বকাপ ফুটবল: মোহাচ্ছন্ন যুবসমাজ

আহমাদ বিন আব্দুস সালাম*

রোমানরা বলত; "মানুষকে যদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে রাখতে চাও, তবে তাদের রুটি ও বিনোদন দাও; তারা বাকি সবকিছু ভুলে যাবে।"

প্রাচীন রোমান সাহিত্যিক Juvenal বলেছিলেন;

i am pridem, ex quo suffragia nulli vendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses.

"বহু আগে থেকেই জনগণ তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব ও আগ্রহ ত্যাগ করেছে। যারা একসময় ক্ষমতা, শাসন, সৈন্যবাহিনী এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করত, তারা এখন কেবল দু'টি জিনিসই উদ্বেগের সঙ্গে চায়: রুটি এবং সার্কাস (অর্থাৎ- খাদ্য ও বিনোদন)।"

হে তরুণ দল! তোমরা যাদের পায়ের জাদুতে মত্ত, যাদের নীল-সাদা আর হলুদ-সবুজ জার্সির উন্মাদনায় মেতে রাত পার করে দিচ্ছ, তোমরা কি জানো সেই লাতিন আমেরিকার মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে তোমাদেরই ভাই-বোনের রক্তের ইতিহাস? যে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেস আর ব্রাজিলের রিউ দি জানেইরু'র জয়ে তোমরা আতশবাজি ফোটাও, সেই মাটির বাঁকে বাঁকে মিশে আছে মুসলিম নিধনের নির্মম, পৈশাচিক ক্রন্দন! অথচ তোমরা আজ আত্মবিস্মৃত, মোহাচ্ছন্ন!

জাগো, হে বাংলার মুসলিম তরুণ-তরুণী! চোখ খোল। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখো, পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে যখন স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের নামে আন্দালুসিয়ার (স্পেন) বুকে মুসলিমদের ওপর নেমে এসেছিল অমানুষিক নির্যাতন, যখন জীবন্ত পুঁড়িয়ে মারা হচ্ছিল মোলায়েম হৃদয়ের মু'মিনদের, তখন জীবন বাঁচাতে বহু মরিস্কো (স্পেনীয় মুসলিম) এবং মুদাজ্জার বুকভরা ক্ষত নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এই লাতিন আমেরিকার বুকে। কিন্তু হায়! সেখানেও রক্তপিপাসু পর্তুগিজ আর স্প্যানিশ ক্রুসেডাররা তাদের রেহাই দেয়নি।

ব্রাজিলের বাহিয়া প্রদেশে যখন কৃষ্ণাঙ্গ 'মালে' মুসলিমরা দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে কেবল নিজেদের ধর্ম আর স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছিল, তখন তলোয়ারের আঘাতে তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের পবিত্র কুরআন পুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের ঈমানী পরিচয়। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে মুসলিমদের পরিচয় মুছে দিতে তাদের নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে, নামাতে হয়েছে খ্রিষ্টীয় ধর্মের জোয়াল। আজ সেখানে মুসলিমদের যে ভগ্নাবশেষ, তা কোনো স্বাভাবিক বিবর্তন নয় তা এক পরিকল্পিত মহাধ্বংসের নির্মম দলিল! অথচ আজ তোমরা সেই রক্তের দাগ লাগা মাটিতে পায়ে ফুটবল ও জাদু দেখে নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করে দিচ্ছ? যে লাতিন ফুটবলারদের জয়ে তোমরা আবেগে ভাসছ, তারা কি কখনো ফিলিস্তিন, কাশ্মীর কিংবা উইঘুরের মুসলিমদের কান্নায় একটিবারের জন্যও ব্যথিত হয়েছে? না, হয়নি! তবে তোমরা কেন লাতিনের গোলপোস্টে বল ঢোকানোর উল্লাসে মেতে উঠছ উঠছ? নিজেদের ঈমান আর ঐতিহ্যের গোলপোস্ট রক্ষা করতে শেখো। এই মোহ, এই অন্ধ গোলামির জাল ছিঁড়ে ফেল। ফুটবলকে বিনোদন হিসেবে দেখার পরিমিতিবোধ ফেরাও, একে হৃদয়ের উপাস্য বানিও না। তোমাদের পূর্বপুরুষের রক্তভেজা ইতিহাসকে অবমাননা করো না। হে তরুণ! তুমি তো পরপদলেহী ক্রীড়াদাস নও, তুমি তো বীরের বংশধর! জেগে ওঠো, এই আত্মবিস্মৃতির ঘুম ভেঙে বীরদর্পে সত্যকে চিনে নাও!

লাতিন আমেরিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল হলো এমন দু'টি রাষ্ট্র যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। বিশ্বব্যাপী অন্যান্য পশ্চিমা সমাজের মতো এই অঞ্চলেও মুসলমানদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা মূলত রাষ্ট্রীয় নীতি, পরোক্ষ বৈষম্য, ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা নজরদারি এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক ইসলামোফোবিয়ার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এই দুই দেশে মুসলমানদের অভিজ্ঞতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে সাধারণ কোনো রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বা সরাসরি সরকারি নির্যাতনের চেয়ে সামাজিক ও কাঠামোগত স্তরে পরোক্ষ বৈষম্য এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রাজনীতির কারণে সৃষ্ট পদ্ধতিগত নজরদারিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিকভাবে ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সামরিক স্বৈরশাসন এবং একবিংশ শতাব্দীর "সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ" (War on Terror)-এর প্রতিটি পর্যায়েই স্থানীয় মুসলিমদের নাগরিক অধিকারকে সংকুচিত করেছে।

** শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

আর্জেন্টিনায় মুসলিম উপস্থিতির প্রথম ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক অভিযানের সময়। ব্রাজিলে ইসলামের ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক আমলে। গবেষকদের মতে, পুরো আমেরিকার মধ্যে ব্রাজিলেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আফ্রিকান মুসলিম দাস নিয়ে আসা হয়েছিল। এদের মধ্যে হাউসা, নাগোঁ (ইয়োরুবা) এবং ফুলানি গোষ্ঠীর মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং আরবি ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ। স্থানীয়ভাবে তারা "মালে" (Malê -ইয়োরুবা শব্দ 'ইমালে' বা মুসলিম থেকে উদ্ভূত) নামে পরিচিত ছিলেন। আর্জেন্টিনায় আনুমানিক ৪,০০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ মুসলিম বসবাস করেন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১% থেকে ২.৫%। ১৯৯৬ সালে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফাহাদের আর্থিক সহায়তায় বুয়েনস আইরেসের পালেরমো এলাকায় লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র "কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার" নির্মিত হয়। ব্রাজিলে সরকারিভাবে ২০১০ সালের আদমশুমারিতে মাত্র ৩৫,১৬৭ জন মুসলিম নথিবদ্ধ হলেও মুসলিম সংগঠনগুলোর দাবি অনুযায়ী এই সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। ব্রাজিলে সাও পাওলো রাজ্যের পর পারানা রাজ্যের ফোয দো ইগুয়াসু (Foz do Iguaçu) শহরে সবচেয়ে বেশি মুসলিম বাস করেন।

১৮৩৫ সালের জানুয়ারিতে পবিত্র রমাযান মাসে সালভাদর দা বাহিয়া (Salvador da Bahia) শহরে এক ঐতিহাসিক বিদ্রোহ সংঘটিত করেন, যা "মালে বিদ্রোহ" (Malê Revolt) নামে পরিচিত। বিদ্রোহটি ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রাজিলের রাজকীয় কর্তৃপক্ষ মুসলিমদের ওপর অত্যন্ত নৃশংস দমন-পীড়ন চালায়। এর ফলে আফ্রিকান ইসলাম ও আরবি সাহিত্য চর্চাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং মুসলিমদের প্রকাশ্যে ধর্ম পালনের অধিকার কেড়ে নিয়ে জোরপূর্বক ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। সংবিধানগতভাবে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি স্বীকৃত হলেও আইনি পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক স্তরে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ঐতিহাসিক আধিপত্যের কারণে মুসলিমদের প্রতি পরোক্ষ বৈষম্য সুস্পষ্ট।

আর্জেন্টিনার সংবিধানের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ফেডারেল সরকার রোমান ক্যাথলিক অ্যাপোস্টোলিক চার্চকে বিশেষ আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করবে। এই বিশেষ মর্যাদার কারণে ক্যাথলিক চার্চ স্বয়ংক্রিয়ভাবে "পাবলিক লিগ্যাল পারসন" হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের "প্রাইভেট লিগ্যাল পারসন" হিসেবে গণ্য করা হয়, যার ফলে তাদের কর অব্যাহতি বা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার জন্য পররাষ্ট্র ও উপাসনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে "রেজিস্ত্রো নাসিওনাল দে কুলতোস" (Registro Nacional de Cultos)-এ অত্যন্ত জটিল আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিবন্ধন করতে হয়। সম্প্রতি কিছু স্থানীয় পৌরসভা (যেমন- মেন্দোজার লাস হেরাস) ধর্মীয় ভবন ও মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশাসনিক লাইসেন্স এবং বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যা ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ১৯৮৮ সালের ব্রাজিলের সংবিধানে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হয়। সেখানে ধর্মীয় অবমাননাকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরোক্ষ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম সংগঠন "ফ্যামব্রাস" (FAMBRAS)-এর তথ্য অনুসারে, মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধানে বাধা প্রদান করা হয়, প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে দেয়া হয় না। এমন বৈষম্যমূলক ঘটনা নিয়মিত ঘটে থাকে স্রেফ মুসলিম হওয়ার অপরাধে, যা তাদের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী। বিংশ শতাব্দীতে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সামরিক জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মুসলিম সম্প্রদায়কে কড়া গোয়েন্দা নজরদারিতে রেখেছিল এবং তাদের নাগরিক অধিকার খর্ব করেছিল।

আর্জেন্টিনার সামরিক জান্তা ও আইন ২১.৭৪৫

১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সালের রক্তাক্ত সামরিক জান্তা আমল ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও চরম নিপীড়নের সময়। ১৯৭৯ সালে সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল ভিদেলা অ-ক্যাথলিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যে "আইন ২১.৭৪৫" (Law 21.745) জারি করেন। এই আইনের আওতায় একটি বাধ্যতামূলক জাতীয় ধর্মীয় রেজিস্ট্রি তৈরি করা হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের গতিবিধি নিবিড়ভাবে ট্র্যাক করা। এই আইনের ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, যেকোনো অ-ক্যাথলিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নাম, শিক্ষার্থীদের তালিকা, ধর্মীয় সেমিনার এবং বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত মিশনগুলোর সম্পূর্ণ বিবরণ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এই আইনটি মুসলিমদের স্বাধীন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

ব্রাজিলের সামরিক স্বৈরশাসনের (19 game4-1985) অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল "জাতীয় নিরাপত্তা মতবাদ" (National Security Doctrine), যা যেকোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক বা ভিন্নমতাবলম্বী আন্দোলন দমনে কাজ

করত। ব্রাজিলের নেভি ইন্টেলিজেন্স (Ceninar) এবং ন্যাশনাল ইনফরমেশন সার্ভিস (SNI)-এর অবমুক্তকৃত সরকারি নথিতে দেখা যায় যে, ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রাজিলের সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ব্রাসিলিয়ার ইসলামিক সেন্টারে আরব ও মুসলিমদের মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ সামরিক গোয়েন্দা নজরদারি ও হয়রানির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ২০১৬ সালের অলিম্পিক গেমসের আগে মার্কিন চাপ এবং ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর নিষেধাজ্ঞার হুমকিতে ব্রাজিল সরকার ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ "আইন ১৩.২৬০" (Lei 13.260) বা সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইন পাস করে। এই আইনটি পাসের পর ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ এবং প্রসিকিউটরদের মুসলিমদের ব্যক্তিগত ডিভাইস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইন যোগাযোগের ওপর ব্যাপক নজরদারি করার আইনি ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই আইনের প্রয়োগ হিসেবে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ফেডারেল পুলিশ "অপারেশন হ্যাশট্যাগ" (Operation Hashtag) পরিচালনা করে ১২ জন মুসলিমকে আইএসআইএস (ISIS)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার সন্দেহ থেকে গ্রেফতার করে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং প্যারাগুয়ের ভৌগোলিক সংযোগস্থলে অবস্থিত ট্রাই-বর্ডার অঞ্চল (Tri-Border Area - TBA) হলো লাতিন আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা নজরদারির কেন্দ্রবিন্দু।

ট্রাই-বর্ডারে নজরদারির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আসাদ আহমাদ বারাকাতের (Assad Ahmad Barakat) মামলা। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে আর্জেন্টিনার ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) পুয়ের্তো ইগুয়াসুর (Puerto Iguazú) একটি ক্যাসিনো ব্যবহার করে প্রায় ১ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগে বারাকাত ক্ল্যানের ১৪ জন লেবানিজ বাসিন্দার সম্পদ পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাজিলীয় পুলিশ বারাকাতকে ফোজ দো ইগুয়াসু থেকে গ্রেফতার করে এবং ২০২০ সালে প্যারাগুয়েতে প্রত্যর্পণ করে। এই ধরনের ঘটনাকে পুঁজি করে পুরো লেবানিজ মুসলিম সমাজকে "সম্ভাব্য বৈশ্বিক নিরাপত্তা হুমকি" হিসেবে প্রচার করা হয়। ২০২৪ সালের ১১ এপ্রিল আর্জেন্টিনার সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত (Court of Cassation) এক ঐতিহাসিক রায়ে ঘোষণা করে যে, ১৯৯৪ সালের এএমআইএ হামলা এবং ১৯৯২ সালের ইসরায়েলি দূতাবাস হামলা ছিল ইরানের রাজনৈতিক ও কৌশলগত নকশার অংশ এবং তা হিজবুল্লাহ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আদালত ইরানকে একটি "সন্ত্রাসী রাষ্ট্র" হিসেবে ঘোষণা করে। তবে হামলার ৩০ বছর পর আদালতের এই রায় কোনো নতুন সুনির্দিষ্ট বস্তুগত প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নয়; বরং প্রধানত গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা নিয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবার এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মধ্যে তীব্র সংশয় তৈরি হয়েছে। এই দীর্ঘ বিচারিক প্রহসন আর্জেন্টিনার মুসলিম ও আরব সম্প্রদায়কে দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক লাঞ্ছনা ও গোয়েন্দা নজরদারির শিকারে পরিণত করেছে।

আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়নে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনগুলোতে সামাজিক অসহিষ্ণুতা এবং বিচারিক দীর্ঘসূত্রতার কথা বারবার উঠে এসেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো তাদের মূল্যায়নে দেখিয়েছে যে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে রাষ্ট্রযন্ত্র সরাসরি মুসলমানদের শারীরিকভাবে নির্যাতন না করে ৯/১১'র পর থেকে নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী নীতিমালার অতি-প্রয়োগের ফলে মুসলমানদের মৌলিক গোপনীয়তার অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ করে ভারতের মতো অন্যান্য দেশে মুসলিমদের ওপর হওয়া নির্যাতনের সাথে তুলনা করে লাতিন আমেরিকার মুসলমানদের তুলনামূলক সমান হলেও ট্রাই-বর্ডার এলাকার মুসলমানদের ঢালাওভাবে হয়রানি তীব্র ভাবে হচ্ছে। ইন্টার-আমেরিকান কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (IACHR) আর্জেন্টিনার বিচারিক প্রক্রিয়ার কঠোর সমালোচনা করে বলেছে যে, "এএমআইএ হামলার ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের কারণে আসল অপরাধীরা পার পেয়ে গেছে এবং নির্দোষ মুসলিম ও আরব অভিবাসীদের দশকের পর দশক ধরে সন্দেহের তালিকায় রেখে তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।"

আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গাজা যুদ্ধের পর ব্রাজিলে মুসলিমদের ওপর সামাজিক ইসলামোফোবিয়া কীভাবে চরম রূপ নিয়েছে তা উন্মোচন করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাও পাওলোর উপকণ্ঠে সাধারণ মুসলিম নারীদের "হামাসের মেয়ে" বা "সন্ত্রাসী" বলে গালিগালাজ করা এবং হিজাব টেনে খুলে ফেলার মতো সহিংস ঘটনা ঘটছে। আল জাজিরা দাবি করে যে, কট্টরপন্থী ইভাঞ্জেলিক্যাল যাজকদের মুসলিম-বিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্যই এই সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যদিকে বিবিসি, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং রয়টার্স তাদের ঐতিহাসিক প্রতিবেদনে ট্রাই-বর্ডার অঞ্চলটিকে একটি "আইনহীন জঙ্গল" বা "সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল"

হিসেবে বর্ণনা করে মার্কিন ন্যারেটিভকে প্রচার করেছে। ওসামা বিন লাদেন এই অঞ্চলে লুকিয়ে ছিলেন –এমন কাল্পনিক দাবিও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছড়ানো হয়েছিল। এমনকি নেটফ্লিক্সের "ট্রিপল ফ্রন্টিয়ার" (2019)-এর মতো চলচ্চিত্রগুলোও এই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ অপরাধপ্রবণ ও অরক্ষিত হিসেবে দেখিয়ে সাধারণ মুসলিমদের বৈশ্বিক নিরাপত্তাহীনতার সাথে যুক্ত করেছে, যা স্থানীয় মুসলমানদের জীবনযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণায় লাতিন আমেরিকার মুসলমানদের জীবনের দু'টি ভিন্ন দিক উঠে এসেছে –ঐতিহাসিক প্রতিরোধ এবং সমসাময়িক নিরাপত্তাকরণ।

নৃতত্ত্ববিদ সিলভিয়া মন্টিনিগ্রো তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ট্রাই-বর্ডার এলাকার মুসলমানদের ওপর যে গোয়েন্দা নজরদারি ও সন্দেহ বিরাজ করছে, তা মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ভূ-রাজনীতির ফল। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর দক্ষিণ আমেরিকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এবং ইরানের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি রাখার অজুহাত হিসেবে এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজকে "বলির পাঁঠা" (Scapegoat) বানিয়েছে। সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের (USP) নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিরোসি বারবোসা এবং তার গবেষণা দল "GRACIAS" ব্রাজিলে ইসলামোফোবিয়ার ওপর একাধিক গভীর জরিপ ও রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ৩য় ইসলামোফোবিয়া রিপোর্টে মুসলিম নারীদের প্রতি ভয়াবহ বৈষম্যের চিত্র গবেষণালব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।

জরিপের ক্ষেত্র (ড. বারবোসার সমীক্ষা) ৩য় ইসলামোফোবিয়া রিপোর্টের পরিসংখ্যান ও বিবরণ (২০২৬)

পদ্ধতিগত বৈষম্যের স্বীকারোক্তি ৯২.২% উত্তরদাতা মনে করেন ব্রাজিলে মুসলিম নারীদের পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে হেনস্থার অভিজ্ঞতা ৮০% মুসলিম নারী ব্যক্তিগতভাবে কোনো না কোনো স্তরে বৈষম্য ও ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছেন।

সহিংসতার ধরন ও স্থান রাস্তাঘাট, কর্মক্ষেত্র এবং বিদ্যালয়ে হিজাব টানাহেঁচড়া করা, পাথর ছুঁড়ে মারা এবং মুখমণ্ডলে কীটনাশক স্প্রে করার মতো ঘটনা।

পুরুষদের মধ্যে ইসলামোফোবিয়ার প্রভাব ৫৪% পুরুষ (জন্মগত মুসলিম ও ধর্মান্তরিত) জানিয়েছেন যে তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলে বসবাসরত মুসলমানদের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও বৈষম্যের ইতিহাস এক জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাহিয়ার মালে বিদ্রোহ দমন এবং বিংশ শতাব্দীর সময়কালে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও কড়া নজরদারির যে ধারা চালু হয়েছে, আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে তা এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান সময়ে মুসলিমদের অভিজ্ঞতা সরাসরি শারীরিক দমন-পীড়নের পরিবর্তে মূলত পরোক্ষ প্রশাসনিক বৈষম্য, আইনি অসমতা এবং মার্কিন নিরাপত্তা নীতির প্রভাবে সৃষ্ট ভূ-রাজনৈতিক নজরদারির সাথে সম্পর্কিত।

একই সাথে, বৈশ্বিক মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সামাজিক প্রতিফলন হিসেবে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে বিশেষ করে হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীরা ক্রমবর্ধমান জেন্ডারভিত্তিক ইসলামোফোবিয়ার শিকার হচ্ছেন।

তথ্য সূত্র:

১. *Mariz, C.L. and Freston, R. (2016) 'Islam in Latin America', in Garrard-Burnett, V., Freston, P. and Dove, S.C. (eds.) "The Cambridge History of Religions in Latin America". Cambridge: Cambridge University Press, pp. 714–722. https://doi.org/10.1017/CHO9781139032698.045 ।*

২. *Montenegro, S. (2022) 'The framing of Muslims as threatening "Others" in the tri-border region of Brazil–Argentina–Paraguay', in Bakali, N. and Hafez, F. (eds.) "The Rise of Global Islamophobia in the War on Terror: Coloniality, Race, and Islam". Manchester: Manchester University Press, pp. 149–166. https://doi.org/10.7765/9781526161765.00018 ।*

৩. *Dury, J. (2024) 'The Threat in the Hemisphere: The Securitization Movement in the Triple Frontier and the Case of Hezbollah'. 'Studies in Conflict & Terrorism". Abingdon: Taylor & Francis ।*

৪. *U.S. Department of State. (2023) '2023 Report on International Religious Freedom: Argentina". Washington, DC: U.S. Department of State ।*

৫. *Al Jazeera. (2024) 'Outraged: Brazilian Muslims face growing Islamophobia over Gaza war'. Available at: https://www.aljazeera.com/ (Accessed: 10 July 2026) ।*

৬. *Mauleón, M. (2022) 'Religious Freedom without Equality? Religious Minorities and the Establishment of Religion in Argentina'. "Journal of Law and Religion", 37(3), pp. 425–448 ।*

৭. *Al Jazeera. (2024) 'Hezbollah "financier" arrested in Brazil'. Available at: https://www.aljazeera.com/ (Accessed: 10 July 2026) ।*

৮. *Islamophobia Observatory. (2022) "Report on Islamophobia in Brazil". ResearchGate ।*

عَالَمُ النِّسَاءِ / মহিলা জগত

কুরআন হাদীসের আলোকে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের বিধান

আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমাদ

[দ্বিতীয় (শেষ) পর্ব]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ". قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

"ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমরা যদি এ দরজাটি কেবল মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই, তবে ভালোই হয়। নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অতঃপর ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরজা দিয়ে আর কখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি।"[১]

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও মনে মনে চাইতেন যে মহিলারা মসজিদে আসুক এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য মসজিদে প্রবেশের সম্পূর্ণ পৃথক একটি প্রবেশপথ থাকুক। শুধুমাত্র রাসূলের কথার প্রেক্ষিতে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরজা দিয়ে আর কখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি! এটি রাসূলের আনুগত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত সুবহানাল্লাহ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে, আরব ভুখণ্ডে, ইউরোপ আমেরিকা এবং কি বাংলাদেশের যেই সকল আহলুল হাদীস অথবা সালাফী 'আক্বিদাহ্ মানহাজের আলোকে পরিচালিত হয় এবং মসজিদে নারীদের সালাত আদায় করার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে, প্রত্যেকটি মসজিদেই মহিলাদের জন্য পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রবেশ পথসহ নারীদের জন্য পৃথক ওযূখানা ও পৃথক সালাত আদায়ের জায়গা নির্ধারিত রয়েছে, যেখানে মহিলারা নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে কখনো কখনো ওয়াক্তিয়া সালাত, জুমু'আর সালাত, ঈদের সালাত ও কিয়ামুল লাইল বা সালাতুত তারাবীহ আদায় করে থাকে। আমরা দায়িত্ব নিয়েই এ কথা বলতে পারি যে, আলহামদুলিল্লাহ! এই সকল মসজিদে সালাত আদায় করতে আসা নারীদের সাথে কোনো রকম অনাকাঙ্ক্ষিত, নিরাপত্তাহীনতা, অপ্রীতিকর, শ্লীলতাহানি বা মর্যাদাহানীকর, অস্বস্তিকর অথবা অসম্মানজনক কোনো ফিতনামূলক ঘটনা ঘটার নজির নেই। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ، وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

"উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ঈদের দিন আমাদের বের হবার আদেশ দেয়া হত। এমনকি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল হতে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত-সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা তারা আশা করত।"[২]

অর্থাৎ- ঈদের দিনে নারীদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়া হতো এবং কুমারী, ঋতুমতী মেয়েদেরকেও আদেশ দেয়া হতো। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় নারীরা কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতো না, আর দু'আর নামে তথাকথিত সম্মিলিত মুনাজাত বলেও সেখানে কিছু ছিল না। যেমনটি আমরা আজকের দিনেও দেখতে পাই যে হজ্জের সময় আরাফাতের মতো দু'আ কবুলের মর্যাদাপূর্ণ জায়গাতেও তথাকথিত সম্মিলিত মুনাজাত বলে কিছু হয় না! তাই বলে মহান আল্লাহর মেহমানগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং আরাফাতের খুতবার খতীব মহোদয় সামগ্রিকভাবে দু'আ করতে কিন্তু ভুলেন না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ، سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا".

"উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন। আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের করে দেই- পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সবাইকে। তবে ঋতুবতী মহিলারা সালাত থেকে বিরত

[১] *সুনান আবূ দাঊদ (তাহকিককৃত)*- ৫৭১।

[২] *সহীহ বুখারী*- ৯৭১।

থাকবে। বাকী পুণ্যের কাজে ও মুসলিমদের দু'আয় শারীক হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো চাদর ওড়না নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তার জন্য বোন তাকে নিজ চাদর বা ওড়না পরিয়ে দিবে।"[১]

অর্থাৎ- নারীগণ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের হতো, ঋতুবতী মহিলারা সালাত থেকে বিরত থাকতো তবে দু'আয় শরীক হতো এবং ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য কারো কাছে চাদর বা ওড়না না থাকলে কোনো মহান আল্লাহর বান্দী তাকে চাদর বা ওড়না ধাঁর দিয়ে হলেও ঈদের মাঠে নিয়ে যেতো। সুবহানাল্লাহ! এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক তাওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাক্বওয়া-এর উত্তম দৃষ্টান্ত। মূলত উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

নারীদের জন্য মসজিদে সালাত আদায় করা হারাম/অবৈধ বা নিষিদ্ধ করার স্বপক্ষে যেই দলিলগুলো পেশ করা হয়ে থাকে: হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ".

"ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।"[২]

অর্থাৎ- হাদীসের প্রথম অংশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতে মানা করেছেন এবং হাদীসের দ্বিতীয় অংশে নারীদের জন্য তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম বলেছেন। এই হাদীসের দুইটি অংশের নির্দেশকে সমন্বয় করতে গিয়ে একদল মানুষ নারীদেরকে মসজিদে যাওয়াটাকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন! অথচ হাদীসের প্রথম অংশে নারীদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টিকে অনুমোদিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে ঘরকে উত্তম বলা হয়েছে, এখানে এসে বলাও হয়নি যে হারাম অথবা নিষিদ্ধ; বরং শুধুমাত্র উত্তম শব্দটি নিয়ে আসা হয়েছে, যার দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় না যে একেবারেই অনুত্তম! যদি তাই হতো তবে প্রথম অংশে নারীদের মসজিদে যেতে বাঁধা দিতে নিষেধ করা হতো না; বরং সুস্পষ্টভাবে বাঁধা প্রদান করতেই বলা হতো। যেমনিভাবে নারীদের জন্য মাহরাম ব্যাতীত সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) তার সুনান আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এ "নারীদের মসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে" শিরোনামে ৫৩তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا".

"'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন, নারীদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় সালাত আদায়ের চাইতে তার গৃহে সালাত আদায় করা উত্তম। আর নারীদের জন্য গৃহের অন্য কোনো স্থানে সালাত আদায়ের চাইতে তার গোপন কামরায় সালাত আদায় করা অধিক উত্তম।"[৩]

অর্থাৎ- উপরোক্ত হাদীসে আরো কিছু নতুন শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। নবী (ﷺ) এখানে ঘরের আঙ্গিনার চাইতে ঘরের ভিতরকে উত্তম বলেছেন, আবার ঘরের ভিতরের কোনো জায়গার চেয়ে ঘরের গোপন কামরায় সালাত আদায় করা অধিক উত্তম বলেছেন। এখানেও সেই একই কথা যে নারীদের জন্য ঘরকে সালাত আদায়ের জন্য উত্তম বলা হয়েছে, এখানেও এটা বলা হয়নি যে ঘরের বাহিরে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা হারাম অথবা নিষিদ্ধ; বরং শুধুমাত্র উত্তম ও অধিক উত্তম শব্দটি নিয়ে আসা হয়েছে, এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় না যে একেবারেই অনুত্তম! যদি তাই হতো তবে অন্যান্য হাদীসে নারীদের মসজিদে যেতে বাঁধা প্রদান করতে নিষেধ করা হতো না এবং সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে মহিলারা সালাত আদায় করতে মসজিদে যেতো না; বরং সুস্পষ্টভাবে হাদীসে বাঁধা প্রদান করতেই বলা হতো। তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের ইসলাম বাস্তবসম্মত জীবন ব্যবস্থা যেখানে হোক পুরুষ অথবা নারী, সকলের জন্যই বাস্তবসম্মত এবং সুবিধানজনক পদ্ধতিকে ইসলাম সব সময় প্রাধান্য দিয়েছে। বাস্তবসম্মত কথা হলো যে, মহিলাদের জন্য ৫ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করা সম্ভব নয় এবং খাস করে কোনো মহিলা নিজে থেকে চায়ও না ৫ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়েই আদায় করতে, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে অথবা মাঝে মাঝে মহিলারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতেই পারে। এখানে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি, স্বয়ং নবী (ﷺ) নিজেও নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেননি; বরং উত্তম এবং অধিক উত্তমের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

---

[১] *সহীহ মুসলিম- ১৯৪০।*

[২] *সুনান আবূ দাউদ- ৫৬৭।*

[৩] *সুনান আবূ দাউদ- ৫৭০।*

المعرفة من خلال القصص / গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

জবাব

সুপ্ত রায়হান সজিব★

[তৃতীয় পর্ব]

হঠাৎ, চিৎকার করে কেঁদে ওঠলো মেয়েটা।

"আমার সোনা, আমার মানিক, আমার শত সাধনার ধনকে তোরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস। ফিরিয়ে দে।"--এই বলে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো।

পাশে বসে থাকা মহিলাটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

হঠাৎ, মেয়েটি চেয়ার থেকে ওঠে দাঁড়ালো। পাশে থাকা আরেকটি লোহার চেয়ারের হাতলে মাথা ঠুকিয়ে আর্তনাদ করতে করতে মূর্ছা গেলো।

মহিলাটিকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়ে নিথর দেহটি আঁকড়ে ধরে বৃদ্ধাটি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললো: "আমার মেয়েটা শারীরিকভাবে অনেক অসুস্থ। ওর ইমারজেন্সি ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন। ও অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। হায়েনারা ওকে...।"

কথাটি শেষ করতে পারলো না।

কান্নার মাতম ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো।

আমি সব বুঝতে পারলাম।

কামরা হতে বাকীদের সরিয়ে দিয়ে স্ট্রেচারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

মুখের নেকাব সরাতেই এক বীভৎস দৃশ্যে মনের ভেতরটায় মোচড় দিলো।

কি দেখলাম আমি?

মুখভর্তি ক্ষত চিহ্ন।

আমার কিছু বুঝতে বাকি রইলো না।

এখানে বোনটির চিকিৎসা সম্ভব নয়।

তাই, প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে ওকে নিয়ে জেলা সদর হাসপাতালে গেলাম।

সেখানে ভর্তি করিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম।

দীর্ঘ তিন ঘন্টা পর চিকিৎসা পর্ব শেষ হলো।

বাইরে এসে দেখি বৃদ্ধা মা দুহাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন।

পাশে গিয়ে বসলাম।

নেকাবের বর্ধিত অংশ দিয়ে চোখের অশ্রু মুছতে ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন।

কিন্তু তুচ্ছ বসনে কি আর বাধা মানে?

মনোসমুদ্রের দুঃখ জোয়ারে মুখমন্ডল ভিজে একাকার।

ধীরে ধীরে কান্নার মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো।

বৃদ্ধা মহিলাটির মাথায় হাত রেখে "মা" বলে সম্বোধন করতেই আমার হাত জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠলো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম।

কিভাবে সান্ত্বনা দেব এই মাজলুমকে?

তবুও কথার সুরে ওনাকে শান্ত করলাম।

একপর্যায়ে জানতে চাইলাম সবকিছু।

ওনি উদাস ভঙ্গিতে শূন্যে তাকিয়ে বলা শুরু করলেন।

অনেকটা দীর্ঘসময় নিয়ে শুনলাম ওনার জীবনের বিভীষিকাময় অধ্যায়ের এক করুণ গল্প।

আমি সংক্ষিপ্ত আকারে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করছি–

ওনার নাম রেবেকা রায়ান।

মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটি ওনার ঔরসজাত একমাত্র কন্যা।

তিনি সিটওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন সাবেক ও ইমিরেটাস অধ্যাপিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়টি রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিত্তওয়েতে অবস্থিত।

এই রাজধানী শহরটি পূর্বে "আকিয়াব" নামে পরিচিত ছিল।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডেই পরিবার নিয়ে বাস করতেন।

রোহিঙ্গাদের যেখানে সকল মানবাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেখানে তিনি শুধুমাত্র মেধা ও মননের জোরে এই পদে আসীন হয়েছিলেন।

এক ছেলে ও মেয়ে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার।

ওনার স্বামী সাইদ রায়ান একজন রাখাইন মুসলিম।

অর্থাৎ- ধর্মান্তরিত মুসলিম।

তিনিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন।

★ সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুব্বান।

ওনাদের একমাত্র পুত্র কাওসার রায়ান নামকরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
কাজের সুবাদে তিনি কানাডা থাকেন। মেয়ে ফাতিমা রায়ান আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষাসম্পন্ন করে ঘরকন্যার কাজ শিখছে।
শুনতে কেমন জানি লাগছে, তাই না?
আমিও প্রথমে ভ্রু কুঁচকে ছিলাম,
কিন্তু এটাই বাস্তব।
ফাতিমার বক্তব্য হলো– "জ্ঞান অর্জনের জন্য লেখাপড়া করেছি, চাকরির উদ্দেশ্যে নয়।
উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করলেই কি চাকরি করতে হবে?
চাকরিতে গিয়ে আমি আমার পর্দার বিধান অমান্য করতে চাই না।
মানুষ কি শুধুমাত্র পেশা বেছে আয় করার জন্য বিদ্যার্জন করে?
আরে বিদ্যার্জন তো সবার জন্য ফর্‌য।
যা জ্ঞানার্জন করেছি তাই যথেষ্ট।
এখন বিয়ে করে একজন সাধারণ গৃহিণী হয়ে সারাজীবন কাটাতে চাই।
জান্নাত পাগল মেয়েদের জন্য এর চেয়ে সহজ মাধ্যম আর দ্বিতীয়টি নেই।"
বাবা-মাও সেটাই মেনে নিয়েছে।
বর ছোটবেলা হতেই নির্বাচিত।
সাইদ সাহেবের বন্ধু আজমত খানিয়ার একমাত্র পুত্র আব্বাস খানিয়া।
বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলো।
সাইদ সাহেব ধর্মান্তরিত হলেও ওনার পরিবারের সাথে সম্পর্কের ফাটল ধরেনি।
বাবা-মা বহুকাল আগেই ইহলোক ত্যাগ করলেও ছোট তিনভাই বেঁচে আছে।
ওনারা ভাইয়ের মতো উচ্চশিক্ষার গন্ডি পেরোতে পারেনি তাই নিরক্ষর হয়ে গ্রামে বাস করে।
ভাইয়েরা আবদার করলেন একমাত্র ভাতিজির বিয়ের অনুষ্ঠান গ্রামেই আয়োজিত হোক।
ভাইদের আবদার রক্ষা করলেন সাইদ সাহেব।
সপরিবারে রওনা হলেন গ্রামের দিকে।
গ্রামের নাম গুদার পাইন।
এটি রাখাইন রাজ্যের মংডু জেলার অধ্যুষিত একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল।
মংডু জেলার মোট জনসংখ্যার ৮০% মুসলিম ধর্মাবলম্বী।
এদের অধিকাংশের বাস এই গুদার পাইন গ্রামেই।
পুরো মায়ানমার জুড়ে ভালো নেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে "পৃথিবীতে সবচেয়ে কম প্রয়োজন বোধ করা" এবং "সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে অন্যতম" বলে অভিহিত করা হয়।
রোহিঙ্গাদের মুক্তভাবে চলাফেরা এবং উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে অনেক আগেই।
বার্মিজ জাতীয়তা আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে তাদের বার্মিজ নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
তারা কোনো সরকারি অনুমতি ছাড়া ভ্রমণ করতে পারে না এবং পূর্বে তাদের দুই সন্তানের বেশি না নেয়ার প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করতে হত, যদিও এই আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি।
কিন্তু দুইয়ের অধিক সন্তান নেওয়ার পর অতিরিক্ত সন্তান নিতে হলে সরকারি প্রশাসনের কাছে আবেদন করতে হয়- যা অনেক অপমানজনক ও হয়রানিমূলক। সাধারণত রোহিঙ্গা পুরুষদের সপ্তাহে এক দিন বিনামূল্যে সামরিক ও সরকারি প্রকল্পে কাজ করতে এবং এক রাতের জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হয়-যা খুবই ন্যক্কারজনক।
রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের অন্যত্র থেকে গমন করা বৌদ্ধ বাসিন্দাদেরকে সরকার কর্তৃক বাধ্যগত হয়ে জমি প্রদান করায় অনেক জমি হারিয়েছে।
আরো নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে এরা এখনো টিকে আছে।
স্থানীয় রাখাইনদের অত্যাচারের মাত্রাও দিনকে দিন বেড়েই চলছে।
তবুও, মাতৃভূমি ছাড়তে ওরা নারাজ।
১৭৮৪ সালে বার্মার খ্রিষ্টান রাজা তৎকালীন আরাকান (বর্তমান রাখাইন রাজ্য) দখল করলে সর্বপ্রথম মুক্ত রোহিঙ্গা জাতির কপালে দুর্দশা নেমে আসে।
১৯৪২ সালে জাপান কতৃক বার্মা দখলের পর রোহিঙ্গাদের ওপর নারকীয় তাণ্ডব চালানো হয়।
এসময় স্থানীয় দস্যুসম মগরা জাপানি সৈন্যদের সহায়তায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করে।
এটি "১৯৪২ সালের গণহত্যা" নামে ইতিহাসে এক কলংকিত অধ্যায় হিসেবে অভিহিত।
১৯৬২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের পর অতীত নির্যাতনের সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৮২ সালে মিয়ানমারে নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন ও কার্যকর হওয়ার ফলে সকল রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়।

তখন ওরা একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে সকল মানবাধিকারের লাইসেন্স হারায়।

১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৯০ এবং ২০১২ সালে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে বর্বরতম অভিযান পরিচালনা করে বার্মার সামরিক জান্তা সরকার।

এভাবেই শত যন্ত্রণার মাঝেও মাতৃভূমির মাটি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

তো, গ্রামেই ওদের বিয়ের সকল বন্দোবস্ত করা হলো।

নির্ধারিত তারিখের কয়েকদিন আগেই রায়ান পরিবার গ্রামে এলো।

ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে সাইদ রায়ানকে এলাকায় ভিন্নচোখে দেখা হয়। বেশিরভাগ আত্মীয় রায়ান পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

এমনকি কথা পর্যন্ত বলে না।

অনুজ ভাইত্রয় দরিদ্র বিধায় সাইদকে মান্য করে।

সাইদ ভাইদের যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করে।

এলাকাবাসীর ধারণা ওরাও প্রতিষ্ঠিত হলে সাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতো।

তবুও, নাড়ির টানে বারবার গ্রামে আসেন।

গ্রামটি তাঁর কলিজায় স্থান দখল করে নিয়েছে।

বিয়ের দিন...

আয়োজনের কোনো কমতি রাখেনি সাইদ রায়ান।

ধার্মিক পরিবারের বিয়েতে যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু আয়োজনের মাঝেই বিয়ে বাড়িটা যথেষ্ট পূর্ণতা পেয়েছে। এই পরিবারটি অতিমাত্রায় আল্লাহ ভীরু বিধায় আয়োজনে বিলাসিতার ছিটেফোঁটা নেই।

সব মিলিয়ে বলা চলে "আল-হামদুলিল্লাহ"।

মেয়ে হিসেবে ফাতিমা যথেষ্ট ধার্মিক।

কুমারী হয়ে ওঠার পর নিজের অজান্তে ব্যতীত কখনো কোনো পরপুরুষ তাঁকে দেখেনি।

গাইরে মাহরামের নিয়মাবলি সে মেনে চলে।

কিন্তু, মনটা বড় টানতো ছোট্ট বেলার খেলার সাথী আব্বাসের প্রতি।

একই সাথে বেড়ে ওঠলেও কুমারী হয়ে ওঠার পর ওর সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি।

তবুও কোনো অচেনা মায়ার টানে ওকে খুব ভালো লাগতো।

তাইতো, মা বিয়ের ব্যাপারে ওর প্রসঙ্গ তুলতেই সানন্দে অতি লজ্জায় মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল।

অপরদিকে, আব্বাস যথেষ্ট বিদ্বান ও ঈমানদার ব্যক্তি।

মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর সৌদি আরবেই চাকরি পেয়েছে।

ওর পুরো পরিবার সেখানেই থাকে।

এখন বিয়ে করে বউকেও নিয়ে যাবে।

সব মিলিয়ে দারুণ একটি মেলবন্ধন।

বরযাত্রী এলো, খানাপিনা হলো।

ফাতেমীয় পদ্ধতিতে বিয়ে সম্পন্ন হলো।

বর ও কনেকে একটি বদ্ধ রুমে একত্র করা হলো রীতি অনুযায়ী সালাত পড়ানোর জন্য।

ওদেরকে রেখে সবাই বাইরে চলে আসলো।

সালাত শেষ, দু'জনই নিশ্চুপ।

ফাতিমার ঘোমটা সরিয়ে দিলো আব্বাস।

পরমুহূর্তেই সেটা মাথায় তুলে নিলো ফাতিমা।

আব্বাস কথার খই ফুটিয়ে নীরবতা ভাঙলো।

"তুমি এখনো সেই ছোট্টবেলার মতো লাজুকই রয়ে গেলে। বদলালে না"-নিচুস্বরে বললো আব্বাস।

ফাতিমা মুচকি হেসে আব্বাসের ডান হাতটি জড়িয়ে ধরলো। ঘোমটা সরিয়ে ওর ডান কাঁধে মাথা রাখলো।

"তাই, আপনিও তো সেই আগের মতোই দুষ্টুটি রয়ে গেছেন" -ফাতিমার প্রত্যুত্তর।

তারপর আবার পিনপতন নীরবতা।

"চোখ বন্ধ করুন হে প্রিয়" -নীরবতা ভেঙে ফাতিমার অনুরোধ। আব্বাস মুচকি হেসে কিছু না বলে কর্তব্য পালন করলো।

ফাতিমা কাগজে মোড়ানো প্যাকেট খুলে মেরুন রঙের একটি হাফ সোয়েটার বের করল।

যেটা সে দীর্ঘদিন যাবৎ ওলের সুতা দিয়ে কুশিকাটায় তৈরি করেছে। ও জানে রঙটা আব্বাসের খুবই প্রিয়।

"এবার চোখ খুলুন" -মুচকি হেসে ফাতিমার অনুনয়।

আব্বাস চোখ খুলে অবাক হয়ে যায়।

মুচকি হেসে দু'হাত বাড়িয়ে সোয়েটারটি নিতে উদ্যত হয়। কিন্তু হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণের উচ্চশব্দে ওরা চমকে ওঠে।

বাইরে থেকে কান্না ও আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে।

আব্বাস উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু, ফাতিমা ওর হাত টেনে ধরে। *[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

قصيدة / কবিতা

আজাদীর লড়াই

আব্দুল্লাহ আল নুমান

আমরা আছি আজাদীর লড়াইয়ে,
অন্যরা ব্যস্ত ক্ষমতার বড়াইয়ে।
আমরা খুঁজি সত্যের আলোর দিশা,
তারা ডুবে থাকে স্বার্থের নেশায়।
আমরা চাই ন্যায়ের পতাকা উড়ুক,
তারা চায় সিংহাসন আরও উঁচু হোক।
আমরা জাগাই বিবেকের ডাক,
তারা গড়ে মিথ্যার নতুন ফাঁক।
আমরা লড়ি আদর্শের শক্তি নিয়ে,
তারা হাঁটে ক্ষমতার অন্ধ পথ বেয়ে।
আমরা জ্বালাই সত্যের প্রদীপ হাতে,
তারা ঢাকে আলো মিথ্যার আঘাতে।
আমরা লিখি ইতিহাস রক্তের কালিতে,
তারা ডুবে থাকে দুনিয়ার লোভের জালিতে।
আমরা দাঁড়াই অত্যাচারের বিরুদ্ধে,
তারা বিকায় স্বার্থের ক্ষুদ্র মঞ্চে।
আমরা শুনি মুক্তির নতুন প্রহর,
তারা গড়ে অন্ধকারের শহর।
আমরা জাগি সত্যের আহ্বানে,
তারা হারায় মিথ্যার টানে।
একদিন জাগবে ন্যায়েরই জোয়ার,
ভেঙে যাবে মিথ্যার সব দোয়ার।
সত্যই জিতবে লেখা শেষ পাতায়,
মিথ্যা দাড়াবে ইতিহাসের কাঠগড়ায়।

বিজয়োল্লাসে

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

পুষ্পবনে মুক্ত মনে ভ্রমর করে খেলা
তেরশত নদীর বুকে ভাসছে সুখের ভেলা
নাচছে ময়ূর পেখম তুলে গানের পাখি বুলবুলি,
দোয়েল নাচে লেজ ছড়ায়ে বিজয়ের সুর তুলি।
গগন পবন জল-ভূতল গাইছে একই গান
বিজয়ের উল্লাসে আজ মুগ্ধ সবার প্রাণ
রক্ত দিলো নবীন-প্রবীন শোষণ থেকে হলাম স্বাধীন-
কণ্ঠ থেকে বেড়ি শিকল ভেঙে-চুড়ে পড়ে এ দিন।
বিজয় নামের কুসুম কলি ছড়িয়ে দিলো ঘ্রাণ!
সুখের ঢেউয়ে ভেসে তরি গাইছে মাঝি গান,
একই সুরে বাঁধা যে, আজ হিন্দু মুসলমান।
সব ভেদাভেদ ভুলে গেছে একই যেন প্রাণ।
এই না সুখে ধরার বুকে খুশির নেইতো শেষ,
সুখের হাওয়ায় উড়ছে নারীর মাথার এলো কেশ,
ইতিহাসে রক্তে লেখা সোনার বাংলাদেশ।

* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

আহলে হাদীসের বিপ্লব

নাদিম বিন আবুল কালাম*

আহলে হাদীস সেই শক্তি,
যারা কুরআন-সুন্নাহকে হাতে তুলে
মিথ্যা, শির্ক, বিদআতের অন্ধকার ভেদ করে।

তারা জানে, সত্য কোনো মানুষের আবিষ্কার নয়,
এটি মহান আল্লাহর ওহীর আলো,
সত্যের পথে যে দাঁড়ায়, সে অবিচল।

বাতিল যতই চিৎকার করুক,
বিদআতের ঘন কুয়াশা যতই ছড়িয়ে পড়ুক,
তাওহীদের আগুন তাদের অন্তরে জ্বলতে থাকে।

সাহাবার পথই তাদের মানহাজ,
নবীর সুন্নাহই তাদের জীবন,
এই পথে তারা অটল,
বাতিলের মুখোমুখি দাঁড়ায় নির্ভীক।

দলিল ছাড়া কেউ নেতা নয়,
আল্লাহ ছাড়া কেউ ভয়ের যোগ্য নয়,
হৃদয়ের সিংহাসন একমাত্র রবের।

তারা বলে, "মিথ্যার কাছে আমরা নত হই না,
বাতিলের কাছে মাথা ঝুঁকাই না,
সত্যের পথেই জীবন আর মৃত্যু।"

এই হলো আহলে হাদীসের বিপ্লব, হক্বের সৈনিক,
তাওহীদ ও সুন্নাহর পতাকা হাতে ধরে,
সমাজে সত্যের জোয়ার বইয়ে দেয়।

* *মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

জমঈয়তের নির্বাহী পরিষদের সভা এবং উপদেষ্টা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুলাই শনিবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী পরিষদের সভা শেষে বাদ মাগরিব উত্তরার লাভ লীন কনভেনশন হলে উপদেষ্টা ও সুধীদের নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ ড. হারুন হুসাইন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম জমঈয়তের দাওয়াহ, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে তিনি সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং নতুন প্রকল্পসমূহের রূপরেখা তুলে ধরেন।

এ সময় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তারা বলেন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বাগ্রে জমঈয়তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংগঠনের আদর্শ, দাওয়াহি কার্যক্রম, সাংগঠনিক ভিত্তি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমান সময়ের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ দাওয়াহ সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা, সমাজসেবা, মানবকল্যাণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় জমঈয়তের কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। নতুন প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের শুভানুধ্যায়ী, সদস্য ও দাতাদের আন্তরিক সহযোগিতাও কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা, সুধীজন এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা, দায়িত্বশীলতা ও সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

রাজশাহী মহানগর জমঈয়তের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ সভাপতি, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- রাজশাহী মহানগরীর ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল গত ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর রাণীবাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে উৎসবমুখর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এরশাদ আলী ঈশা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী ও প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন ও শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ডা. সুলতান আহমদ এবং শুব্বানের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে চলমান নানা সংকট ও বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো মুসলিমদের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। তারা সকল বিভেদ ও মতবাদ পরিহার করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, একমাত্র এই আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তাদের হারানো ঐতিহ্য, মর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

কাউন্সিলের শেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদকে সভাপতি এবং রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রশিদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- রাজশাহী মহানগরীর ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের দাওয়াতি, সাংগঠনিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রাজশাহী মহানগরীতে জমঈয়তের ধারাবাহিক কর্মসূচি

বিভিন্ন শাখা কমিটি গঠন: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৯ জুন থেকে ৪ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত

রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশসমূহে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সালফে সালিহীনের আদর্শ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১. কাজলায় শাখা কমিটি গঠন: ২৯ জুন, সোমবার বাদ মাগরিব কাজলা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্পাদক প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। আলোচক ছিলেন জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ আল ফারুক। সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে কাজলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন মাস্টার মো. জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. কায়সারুজ্জামান ও মো. আবুল খায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মো. ময়েন উদ্দীন আহমেদ।

২. রাণীবাজারে শাখা কমিটি গঠন: ৩০ জুন মঙ্গলবার, বাদ মাগরিব রাণীবাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্পাদক প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আলাউদ্দিন সালাফী ও ড. আহমাদুল্লাহ। সমাবেশ শেষে রাণীবাজার শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন মো. মনজুর আহমেদ, সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা গোলাম কিবরিয়া ও মো. রহমাতুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মো. মুশফিকুর রহমান বাবু।

৩. তালাইমারীতে শাখা কমিটি গঠন: ১ জুলাই, বুধবার বাদ মাগরিব তালাইমারী বাদুড়তলা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। আলোচক ছিলেন শহীদুল্লাহ আল ফারুক। সমাবেশ শেষে তালাইমারী শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন মো. মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান ও মো. মতিউর রহমান বুলবুল এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মাওলানা মো. আব্দুস সালাম।

৪. সপুরা ও নওদাপাড়ায় সমাবেশ: ২ জুলাই বৃহস্পতিবার, বাদ মাগরিব সপুরা মিয়াপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ এবং প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ আলোচক ছিলেন শহীদুল্লাহ আল ফারুক।

৩ জুলাই, শুক্রবার বাদ আসর মধ্য নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। আলোচক ছিলেন মাওলানা ইব্রাহিম খলিল। সমাবেশ শেষে পূর্বে গঠিত আহ্বায়ক কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে রূপান্তর করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন মো. আবুল কাশেম, সহ-সভাপতি ডা. মো. রুহুল আমিন ও মো. আশরাফুল আল মামুন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মাওলানা মো. ইব্রাহিম খলিল।

৫. মহিষবাথানে শাখা কমিটি গঠন: ৩ জুলাই, শুক্রবার বাদ মাগরিব মহিষবাথান উত্তরপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সরকারি কলেজের অধ্যাপক ড. আব্দুর রশিদ। আলোচক ছিলেন শহীদুল্লাহ আল ফারুক এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা মতিউর রহমান। সমাবেশ শেষে মহিষবাথান শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন ড. মো. আব্দুর রশিদ, সহ-সভাপতি আলহাজ মো. মতিউর রহমান ও মো. সাইদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মো. শাবিয়ার রহমান।

৬. বহরমপুরে আহ্বায়ক কমিটি গঠন: ৪ জুলাই, শনিবার বাদ মাগরিব বহরমপুর বায়তুল মামুর আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি মো. আব্দুল লতিফ। আলোচক ছিলেন শহীদুল্লাহ আল ফারুক।

সমাবেশ শেষে বহরমপুর শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এতে আহ্বায়ক নির্বাচিত হন মো. আব্দুল লতিফ, সদস্য হিসেবে প্রকৌশলী সাদেকুল ইসলাম, মাওলানা আফসার আলী ও মাওলানা আব্দুর রউফ এবং সদস্য সচিব হিসেবে মো. আবু বকর মনোনীত হন।

সমাবেশগুলোতে নেতৃবৃন্দ বলেন, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন গড়ে তুলতে এবং সালফে সালিহীনের আদর্শ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের

বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচার ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সমাবেশগুলোতে এলাকার আলেম-উলামা, শিক্ষাবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক শুভানুধ্যায়ীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল প্রবাসী জমঈয়তের কাউন্সিল সম্পন্ন এবং নতুন জেলা কমিটি গঠন

জেদ্দা, সৌদি আরব: গত ২৬ জুন (শুক্রবার) সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলের সাতটি অঞ্চল- নাজরান, জিজান, আসীর, মদিনা, তায়েফ, জেদ্দা ও মক্কাতুল মুকাররমা- নিয়ে গঠিত সৌদি আরব প্রবাসী পশ্চিমাঞ্চল জমঈয়াতের কাউন্সিল সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিল শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন সাংগঠনিক জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমাঞ্চলের সভাপতি শাইখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। পরবর্তীতে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে পশ্চিমাঞ্চল প্রবাসী জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ: ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন, শাইখ আইয়ুব সালাফী মাদানী, শাইখ রফিকুল ইসলাম, ডা. সামিউল হক, ড. মুজিবুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার জাফর আহমাদ, শাইখ মুস্তাফিজুর রহমান এবং শাইখ ফরীদ আহমাদ।

কার্যকরী পরিষদ: সভাপতি- শাইখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি- শাইখ হাফিয আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী, ড. আব্দুল খালেক মাদানী, শাইখ আব্দুল হামিদ বিন সিদ্দীক মুহসিন মাদানী, ড. জয়নুল আবেদীন মাদানী ও শাইখ আব্দুল্লাহিল বাকী আব্দুল জলীল, সেক্রেটারি- শাইখ আসলাম হোসেন মাদানী, কোষাধ্যক্ষ- জিয়াউর রহমান সালাফী, সহকারী সেক্রেটারি- শাইখ জসীম উদ্দিন মাদানী ও শাইখ ওয়াহিদুল ইসলাম মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- শাইখ আব্দুর রাকিব মাদানী, সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি- শাইখ ইউসুফ আ. জাহের, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- ইউসুফ আজাদ, তালিম ও তারবিয়াত সম্পাদক- শাইখ মীর আব্দুল্লাহ সাজিদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ মুরাদ পাভেল, সহকারী প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- শাইখ আব্দুল আউয়াল, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- তাওহীদ হোসেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- ড. ফাতেমা জাহরা, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- শাইখ ইমদাদুল হক মাদানী, সহকারী সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- সাইফুল ইসলাম, পাঠাগার সম্পাদক- হাফেজ মোস্তাফিজুর রহমান খন্দকার, দপ্তর সম্পাদক- মো. ইসহাক ভূঁইয়া।

সদস্যবৃন্দ: ইউসুফ বিন ইদরীস, আশরাফ মঈনুদ্দিন, মোহাম্মদ আনিস, মোহাম্মদ ইবরাহীম, মোহাম্মদ ইসমাইল মোল্লা, হাবিবুর রহমান, আব্দুর রাকিব, মিরাজ শেখ, আব্দুল হান্নান, জুবাইর আহমদ, মাহবুবুর রহমান, লুৎফর রহমান, মাহফুজুর রহমান, আবু আইয়ান, মোহাম্মদ সাফী আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ।

কাউন্সিল শেষে নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ সংগঠনের দাওয়াহ, শিক্ষা, সমাজসেবা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

বেলদী পুটিনা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত বেলদী পুটিনা এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯ জুন, রোজ সোমবার, বাদ মাগরীব, পুটিনা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। কুরআন তিলাওয়াত করেন শাইখ জুবায়ের বিন আবু সাঈদ ইমাম ও খতিব অত্র মসজিদ। এতে সভাপতিত্ব করেন শাইখ ফকরুদ্দীন হেলালী সহ-সভাপতি, বেলদী পুটিনা এলাকা জমঈয়ত সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে আলোচনা পেশ করেন শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, শাইখ ইকবাল হাছান, সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, শাইখ কাজী মো. জামাল উদ্দিন। এতে কুরআন সুন্নাহ থেকে দলিলসহ সাংগঠনিক কাজে বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বিগত ৮ জুলাই ২০২৬, শুক্রবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন চারটি মসজিদ সফর ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পশ্চিম লক্ষীপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ, প্রাইমারী স্কুল মাঠ আহলে হাদীস জামে মসজিদ, বিষয়খালী আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও চৌরকোল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ। জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ জুম'আর খুৎবা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বাদ জুমু'আহ্ হাফেয আরাফাতের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও মাওলানা আব্দুস সামাদের উপস্থাপনায় এক আলোচনা ও

পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, জেলা জমঈয়তের বায়তুলমাল সম্পাদক মুহা. খালেদ হাসান, জেলা জমঈয়তের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাও. মুহা. আব্দুস সামাদ, জেলা জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলিগ বিষয়ক সম্পাদক হাফেয মাও. আরজুল্লাহসহ ইলাকা ও শাখা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ। জমঈয়তের কার্যক্রমকে সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক বৈঠক নিয়মিত করা, সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, মাসিক চাঁদা ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাসিক কল্যাণ ফান্ডের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁনের সমাপনী বক্তব্য ও দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভোলাব এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত ভোলাব এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাসিক আলোচনা সভা গত ১০ জুলাই, শুক্রবার বাদ মাগরীব চারিতালুক মাদুর বাপের বাড়ি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপত্বিত করেন শাইখ মো. ইকবাল হাছান সভাপতি, ভোলাব এলাকা জমঈয়ত। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করবেন শাইখ ড. শেখ সাদী বিন আ. রশিদ মাদানী, প্রিন্সিপাল-কটারবাড়ী দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসা, জামালপুর কুরআন সুন্নাহ থেকে দলিল সহ সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এতে উপস্থাপক হিসাবে ছিলেন শাইখ আবুল হোসেন, সহ-সেক্রেটারি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ৩য় মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে পূর্বাচল হাবিবনগর জামে মসজিদে গত ১১ জুলাই, রোজ শনিবার, বাদ আসর হতে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান মোল্লা, পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাইখ ক্বারী শরিফ বিন নুরুল্লাহ, শিক্ষক জামিয়া দারুল ইহসান মাদ্‌রাসা খাইলসা। উক্ত সভায় আলোচনা পেশ করেন শাইখ মোহাম্মদ মাসউদুল আলম আল ওমরী, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মো. ইকবাল হাছান সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস, শাইখ আবুল হোসেন, যুগ্ন-সেক্রেটারি জেনারেল নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন, নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আকবর আলী সদস্য, জেনারেল কমিটি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আলিমুল্লাহ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ খলিলুল্লাহ মোল্লা, সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আ. রহমান মাদানী সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। উক্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন মুহাম্মদ রমজান মিয়া সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। অতঃপর আগামী তিন বছরের জন্য পূর্বাচল এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বান এর একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

দু'আর আবেদন

১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি ও যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে আহলে হাদীস-এর সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী (হাফিযাহুল্লা-হ) অসুস্থ হয়ে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে (ধানমণ্ডি) ভর্তি আছেন এবং ০৯ জুলাই ২০২৬, বৃহস্পতিবার, বিকেলে তাঁর অপারেশন হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অতি দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা ও নেক হায়াত দান করেন, সেই কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তভাবে দু'আ করছি। পাশাপাশি সকল মুসলিম ভাই-বোনের নিকট তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে শিফায়ে কামিলা দান করেন –আমীন।

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَهُ شفاء عاجلا غير آجل.

২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত সহ-সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক ফজলুল বারী খান (মিয়া সাহেব) দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ, বর্তমানে তার অসুস্থতা বেড়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অতি দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা ও নেক হায়াত দান করেন, সেই কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তভাবে দু'আ করছি। পাশাপাশি সকল মুসলিম ভাই-বোনের নিকট তাঁর জন্য বিশেষভাবে দু'আ করার অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে শিফায়ে কামিলা দান করেন –আমীন।

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَهُ شفاء عاجلا غير آجل.

التوعية الصحية / স্বাস্থ্য সচেতনতা

কিছু ঔষধি বৃক্ষ: পরিচিতি কার্যকারিতা ও ব্যবহারবিধি

ভূমিকা: প্রকৃতি মানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। সুস্থ জীবনযাপন এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিকার খুঁজতে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন ভেষজ উদ্ভিদ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশেও নিম, অর্জুন, আমলকি, বেল, হরিতকি, বহেড়া, অশোক, সজিনা, গুলঞ্চ ও দারুচিনির মতো ঔষধি বৃক্ষের ব্যবহার বহু পুরোনো। এসব গাছের পাতা, ছাল, ফল, ফুল, বীজ কিংবা শিকড় বিভিন্ন রোগের উপশমে লোকজ চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আধুনিক গবেষণায়ও এসব উদ্ভিদের অনেক উপাদানের জৈবিক কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এগুলোকে আধুনিক চিকিৎসার বিকল্প নয়; বরং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক চিকিৎসা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১. নিম: নিমকে ঔষধি বৃক্ষের "রানী" বলা হয়। নিমগাছের প্রায় প্রতিটি অংশ–পাতা, ছাল, ফুল, ফল ও বীজ–কোনো না কোনোভাবে উপকারী। নিমের পাতায় জীবাণুনাশক, ছত্রাকনাশক এবং প্রদাহরোধী উপাদান রয়েছে। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন ব্রণ, চুলকানি বা ক্ষুদ্র ক্ষত পরিষ্কারে নিমপাতা ব্যবহৃত হয়। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে বলে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করা হয়। কৃষিক্ষেত্রেও নিম প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারবিধি: পরিষ্কার নিমপাতা বেটে আক্রান্ত স্থানে লাগানো যায়। নিমপাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে গোসল বা ত্বক পরিষ্কার করা যায়। তবে নিমের নির্যাস বা বীজের তেল অতিরিক্ত সেবন করা নিরাপদ নয়।

২. অর্জুন: অর্জুনগাছ মূলত তার ছালের জন্য পরিচিত। আয়ুর্বেদে বহু শতাব্দী ধরে হৃদ্স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্জুনের ছালে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অন্যান্য জৈব সক্রিয় উপাদান হৃদ্যন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে সহায়ক হতে পারে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে, যদিও এ বিষয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

ব্যবহারবিধি: শুকনো ছালের গুঁড়া বা ক্বাথ ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করা হয়। হৃদ্রোগের ওষুধ সেবনকারী ব্যক্তিদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৩. আমলকি: আমলকি একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল এবং ভিটামিন সি-এর অন্যতম সমৃদ্ধ উৎস। এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে আমলকি খেলে হজমশক্তি উন্নত হতে পারে এবং শরীরের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে।

ব্যবহারবিধি: কাঁচা ফল, রস, আচার, মোরব্বা বা শুকনো গুঁড়া হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অতিরিক্ত সেবন করলে কিছু মানুষের পেটে অস্বস্তি হতে পারে।

৪. বেল: বেল একটি সুপরিচিত ঔষধি ফল। পাকা বেল যেমন পুষ্টিকর, তেমনি কাঁচা বেল দীর্ঘদিন ধরে ডায়রিয়া ও আমাশয়ের মতো সমস্যায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বেলের শাঁসে থাকা আঁশ হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে।

ব্যবহারবিধি: পাকা বেলের শরবত গরমের সময় পুষ্টিকর পানীয় হিসেবে জনপ্রিয়। কাঁচা বেলের ক্বাথ ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করা হয়।

৫. হরিতকি: আয়ুর্বেদে হরিতকিকে "অমৃত ফল" বলা হয়। এটি হজমশক্তি উন্নত করতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ব্যবহৃত হয়। হরিতকি শরীরের বর্জ্য অপসারণে সহায়ক বলে বিশ্বাস করা হয় এবং এটি ত্রিফলা নামক বিখ্যাত ভেষজ মিশ্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ব্যবহারবিধি: শুকনো ফলের গুঁড়া পরিমিত মাত্রায় সেবন করা হয়।

৬. বহেড়া: বহেড়াও ত্রিফলার অন্যতম উপাদান। এটি কাশি, গলাব্যথা ও হজমের সমস্যায় লোকজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। বহেড়ার ফলে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে, যা শরীরের কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্যবহারবিধি: শুকনো ফলের গুঁড়া বা ক্বাথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭. অশোক: অশোক শুধু সৌন্দর্যবর্ধক বৃক্ষ নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি গাছও। বিশেষ করে নারীদের কিছু স্বাস্থ্যসমস্যায় অশোকের ছাল বহুদিন ধরে আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে যেকোনো ভেষজ ওষুধ ব্যবহারের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ব্যবহারবিধি: ছালের ক্বাথ বা প্রস্তুতকৃত ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৮. সজিনা: সজিনাকে "অলৌকিক বৃক্ষ" বলেও অভিহিত করা হয়। এর পাতা, ফুল ও ফল অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং ভিটামিন এ, সি, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ। অপুষ্টি দূরীকরণে সজিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ব্যবহারবিধি: পাতা শাক হিসেবে, ডাঁটা তরকারি হিসেবে এবং শুকনো পাতার গুঁড়া খাদ্যপরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৯. গুলঞ্চ (গিলয়): গুলঞ্চ একটি আরোহী ঔষধি উদ্ভিদ। আয়ুর্বেদে এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিছু গবেষণায় এর প্রদাহরোধী ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ব্যবহার করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। **ব্যবহারবিধি:** কাণ্ডের ক্বাথ বা গুঁড়া ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করা হয়।

১০. দারুচিনি: দারুচিনি একটি সুপরিচিত মসলা হলেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি বৃক্ষের ছাল। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে এবং এটি হজমে সহায়ক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। রান্না ও পানীয়ে সীমিত পরিমাণে দারুচিনি ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসের অংশ হতে পারে। **ব্যবহারবিধি:** রান্না, চা বা বিভিন্ন খাদ্যে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার: ঔষধি বৃক্ষ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের এক অমূল্য অংশ। নিম, অর্জুন, আমলকি, বেল, হরিতকি, বহেড়া, অশোক, সজিনা, গুলঞ্চ এবং দারুচিনি শুধু ঐতিহ্যগত চিকিৎসা নয়, আধুনিক গবেষণারও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব উদ্ভিদে বিদ্যমান বিভিন্ন জৈব সক্রিয় উপাদান মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় সম্ভাবনাময় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহারের জন্য সঠিক মাত্রা অনুসরণ করা এবং প্রয়োজনে নিবন্ধিত চিকিৎসক বা ভেষজ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য। প্রকৃতির এই মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।

জরুরি
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
টাঙ্গাইল শহরের প্রাণকেন্দ্র সৃষ্টি রোডস্থ
বিশ্বাস বেতকা কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ
ও মসজিদ সংলগ্ন
ড. এম. বারী হাফেজিয়া ও কওমী মাদরাসা'-এর জন্য
একজন প্রিন্সিপাল কাম খতিব নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
- স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- বিদেশি ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

বেতন ও সুবিধা
★ প্রাথমিক বেতন: 40,000 (চল্লিশ হাজার) টাকা।
★ থাকা ও খাওয়া সম্পুর্ণ বিনামুল্যে।
★ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।

আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় সনদপত্রের স্ক্যান কপি 31/07/2026 ইং তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে প্রেরণ করে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ
এড. মাহবুবুর রহমান
সেক্রেটারি
কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ
সৃষ্টি রোড, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল।
মোবাইল: 01712-029164

মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন
সেক্রেটারি
টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস
মোবাইল: 01716-100727

আল্লাহ তা'আলা উত্তম ব্যক্তিকে কবুল করুন

স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে– তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। *ইবনু হিব্বান- মা: শা:, হা: ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা: শা:, হা: ১৬৬১।*

আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণের প্রতিদান জান্নাত

(এক) আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো 'আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। যখন ঐ ব্যক্তিটি প্রত্যাবর্তন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, যদি সে তার ওপর 'আমল করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। *সহীহ্ মুসলিম- হা: ১৩।*

(দুই) জুবায়র ইবনু মুত্'ইম (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন; আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। *সহীহুল বুখারী- মা: শা:, হা: ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম- হা: ২৫৫৬।*

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***তালাক সংক্রান্ত লিখিত বা মৌখিক ফাতাওয়া দিয়ে মানুষের কাছে থেকে টাকা নেয়া যাবে কিনা? দয়া করে সুন্নাহের আলোকে বিস্তারিত কুরআন জানাবেন।***

আবু আব্দুল্লাহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জবাব: তালাক বা যে কোনো ফাতাওয়া মৌখিকভাবে দিয়ে টাকা না নেওয়ায় উত্তম। তবে হাদীয়া হিসেবে দিলে নেওয়া বৈধ আছে। ফাতাওয়া দিয়ে টাকা নেওয়া বৈধ না অবৈধ এ নিয়ে আলেমদের মাঝে পাঁচটা মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, "কেবল ফাতাওয়া দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম, অর্থাৎ- যখন মুফতির ওপর কোনো অতিরিক্ত কষ্ট বা ব্যয় নেই এবং ফাতাওয়া প্রদানের জন্য তাকে জীবিকা অর্জনের অন্যান্য উপায় থেকে বিরত থাকতে হয় না, তখন ফাতাওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ নয়, যদি তিনি অর্থের মুখাপেক্ষী না হন।

তবে যদি তিনি আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্ত হন, যেমন- বায়তুল মাল থেকে তাঁর কোনো ভাতা না থাকে, অথবা থাকলেও তা তাঁর প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাঁর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে। কারণ এতে তাঁর নিজের ক্ষতি দূর হবে এবং প্রশ্নকারীরও ক্ষতি দূর হবে, কেননা পারিশ্রমিক না পেলে তিনি হয়তো ফাতাওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন।

অতএব, এই মতটি সর্বাবস্থায় হারাম বলার মত এবং সর্বাবস্থায় বৈধ বলার মত উভয়ের মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ মত। এর মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট সকল দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। *(আল-ফাতাওয়া আল কুবরা- ৩/৩৩; মাজমুয়া ফাতাওয়া- ৩০/২০৭)* আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তালাকসহ যে কোনো ফাতাওয়া লিখে দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। তবে বিনিময় না নেওয়াই উত্তম। বিনিময় নিলে চুক্তি করে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। *(সিফাতুল ফাতাওয়া- ইবনু হামদান ইবনু শাবীব ইবনু মাহমূদ, ৩৫ পৃ.; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন- ৫/৩৭৪)*

জিজ্ঞাসা (০২): ***শাশুড়ির খালাকে বিয়ে করা যাবে কি?***

সাজন মাহমুদ, নরসিংদী।

জবাব: শাশুড়ির খালা আপনার জন্য অস্থায়ীভাবে হারাম তথা আপনার স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাকে বিয়ে করতে পারবেন না। তবে স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক দিলে শাশুড়ির খালাকে বিয়ে করতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ। হাদীস এসেছে, নবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনঝিকে একত্রে বিয়ে না করে। *(বুখারী- ৫১০৯)*

আরবী ভাষায়, 'খালা (الخالة)' শব্দটি মায়ের বোনকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি নানীর বোন, পরনানীর বোন এবং এর ঊর্ধ্বতন সকল মাতৃপুরুষের বোনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *(আল-আহওয়ালুশ-শাখসিয়্যাহ- মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ, পৃ. ৪৫)* সুতরাং শাশুড়ির খালা মানে নানী শ্বাশুড়ির বোন যে হুকুমে খালার মতো হবে।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***আমি ২য় বিবাহ করেছি গোপনে। ১ম স্ত্রী এখন জেনে ফেলেছে আমার অন্য সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমি যে ২য় বিবাহ করেছি এটা তাকে বলতে পারছি না। আমার ১ম ঘরে ২টা সন্তান। এখন আমি কি করবো? ২য় স্ত্রীর বয়স ১৯ বছর।***

মো. রফিকুল ইসলাম
মধুপুর, টাঙ্গাইল।

জবাব: প্রথমত, যদি আপনি সত্যিই শরিয়তসম্মতভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকেন (ওয়ালি, সাক্ষী, মোহর ইত্যাদি পূরণ করে), তাহলে সেটি অবৈধ সম্পর্ক নয়; বরং বৈধ বিবাহ। কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী এটিকে অবৈধ সম্পর্ক মনে করে থাকেন, তাহলে সেই ভুল ধারণা দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া ঠিক হবে না; বরং তা সমস্যাকে আরো বাড়াবে তাই বিষয়টি দ্রুত আপনার প্রথম স্ত্রীকে জানান। ইসলামে একাধিক বিবাহ বৈধ ও প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক নয়, তবে অনুমতি নেওয়া উত্তম, তাহলে সমাধান সহজ হবে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামে একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের অধিকার ও ভরণপোষণে ন্যায়বিচার করা ফর্য। আল্লাহ বলেছেন: "যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একজনই যথেষ্ট।" *(সূরা আন-নিসা: ৩)*

সমতা না করলে হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি দুইজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়লো, কিয়ামতের দিন সে পঙ্গু অবস্থায় উপস্থিত হবে।

(আবূ দাউদ- ২১৩৩, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০৪): ***ইমাম সাহেব 'ইশার সালাতের চতুর্থ রাকআতেও ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যান, এমতাবস্থায় পিছনের অনেক মুসল্লী বিষয়টি বুঝতে না পেরে পরবর্তীতে ইমামের তাকবীর শুনে দাঁড়িয়ে যান. এমতাবস্থায় কেউ তাকবীরও দেয়নি। সেই ক্ষেত্রে ইমাম সাহু সিজদাহ দেন, এতে করে***

সাহু সিজদার মাধ্যমে সালাত আদায় হয়ে যাবে? নাকি আবার নতুন করে সালাত আদায় করতে হবে?

মোসাদ্দেক হোসেন
রসুলপুর, বাগদুয়ার, পীরগঞ্জ, রংপুর।

জবাব: সাহু সাজদার মাধ্যমে সালাত হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। রাসূল (ﷺ)-এরও একবার এমন হয়েছিল। তিনি শুধু সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরিয়েছেন, নতুন করে পুনরায় সালাত আদায় করেননি। ***(বুখারী- ১২২৬)***

জিজ্ঞাসা (০৫): ***আমি আহলে হাদীস হতে চাই। কিন্তু আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বড় বাধা আমার পিতা-মাতা। আমার পিতা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাকে আমি অনেকবার বিদআত সম্পর্কে বললাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন না। আমার করণীয় কি? যাতে পরিবারের সবাইকে সঠিকটা জানাতে পারি। আমি কি আমার পরিবারের সবাইকে আহলে হাদীস হওয়ার জন্য জোর বা আমন্ত্রণ জানাতে পারি?***

মুনতাসির হোসেন মহৎ
মিরপুর- ১, ঢাকা-১২১৬।

জবাব: কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী 'আক্বীদাহ্ ও 'আমল করা ফর্য। এক্ষেত্রে কারো বাঁধায় বিরত থাকা সঠিক হবে না। যেমন- ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম) তার পিতার সাথে করেছেন *(সূরা আল-মুমতাহিনাহ্: ৪)* ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস তার মায়ের সাথে করেছেন *(সূরা আল-'আনকাবূত: ৮; সূরা লুক্বমা-ন: ১৫)*।

'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ না হলে 'আমল কোনো কাজে আসবে না তাই অবশ্যই অবশ্যই বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ ধারণ করতে হবে কারো বাঁধা মানা যাবে না।

তবে আপনার পরিবারকে আহলে হাদীস হওয়ার জন্য জোর করবেন না; বরং হিকমাতের সাথে দাওয়াত দিবেন। আল্লাহ বলেন: "আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।" *(সূরা আন্-নাহ্ল: ১২৫)*

এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হতে পারে—

∴ জোর করবেন না। হিদায়াত মহান আল্লাহর হাতে। আপনার দায়িত্ব হলো দলিলসহ সুন্দরভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

∴ "আহলে হাদীস" নামের দিকে নয়, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণের দিকে আহ্বান করুন। বলুন, "চলুন আমরা দলিল দেখে 'আমল করি।"

∴ পিতা-মাতার সঙ্গে সর্বোচ্চ আদব বজায় রাখুন। তারা যদি আপনার কথা গ্রহণ না-ও করেন, তবুও তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা বা তর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আল্লাহ কুরআনে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তারা ভুলের দিকে ডাকলেও। *(সূরা লুক্বমা-ন: ১৪-১৫)*

∴ তাদের জন্য নিয়মিত দু'আ করুন। কারণ অন্তর পরিবর্তনের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবারকে হিদায়াত দান করুন এবং আপনাকে হিকমত, ধৈর্য ও উত্তম আখলাকের সঙ্গে দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক্ব দান করুন —আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলে তখন ফজরের সুন্নাত পড়ার বিধান কি?***

মো. আশরাফুল আলম
মোচাইনগর, আসমানখালী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব: হারাম। রাসূল (ﷺ) বলেন, সালাতের ইকামাত দেয়া হলে ফর্য সালাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত (আদায়ের নিয়ত) করা যাবে না। ***(মুসলিম- ১৫২৯)***

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইক্বামাত (ইকামত/একামত) হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন: ফজর কি চার রাকআত? ***(বুখারী- ৬৬৩)***

আরো দেখুন, এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের সালাতে ছিলেন। ফলে লোকটি দু' রাকআত আদায় করে জামা'আতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত শেষ করে তাকে বললেন, ওহো অমুক! সালাত কোনটি! যেটি আমাদের সঙ্গে আদায় করলে সেটি না যেটি তুমি একা আদায় করলে? ***(মুসলিম- ৭১২; নাসায়ী- ৮৬৭, সহীহ)***

সুতরাং ফজরের সালাত চলাকালীন সময়ে দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করে জামা'আতে শামিল হওয়া স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস বিরোধি 'আমল।

পক্ষান্তরে, যারা ইবনু মাস'উদসহ কিছু সাহাবার 'আমলকে রাসূলের হাদীসের বিপরীতে এনে দলিল পেশ করে এ বিষয়ে ইবনু আব্দুল বার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত। তিনি বলেছেন যে, 'যখন ফর্য সালাতের ইকামত দেওয়া হয়ে যায়, তখন সেই ফর্য সালাত ছাড়া আর কোনো সালাত নেই।' এ হাদীসটি আবূ সালামাহ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এবং 'আত্বা ইবনু ইয়াসারও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। মতবিরোধের সময় দলিল হলো সুন্নাহ। যে ব্যক্তি সুন্নাহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে, সে সফল হয়েছে; আর যে ব্যক্তি সুন্নাহ অনুযায়ী 'আমল করে, সে মুক্তি লাভ করেছে।" *(আত-তামহীদ- ২২/৭৪)*

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে এমন একটি বর্ণনাও এসেছে। আল-বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা *(৫/২৯১)*-এ বর্ণনা করেছেন: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যখন

সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফর্য সালাত ছাড়া আর কোনো সালাত নেই তবে ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) ব্যতীত।" কিন্তু এই সনদটি দুর্বল (য'ঈফ)। এ সম্পর্কে ইমাম বাইহাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "এই অতিরিক্ত অংশের ('তবে ফজরের দুই রাকআত ব্যতীত') কোনো ভিত্তি নেই। হাজ্জাজ ইবনু নুসাইর এবং আব্বাদ ইবনু কাসীর উভয়েই দুর্বল রাবী। আর কেউ কেউ হাজ্জাজ থেকে একই সনদে 'আত্বা'র পরিবর্তে 'মুজাহিদ' উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এটিও গ্রহণযোগ্য নয়।" *(আস-সুনানুল কুবরা- ৫/২৯১)*

ইমাম আবূ হানীফাহ্'র ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, সুন্নাত না আদায় করে জামা'আতেই ঢুকতে হবে। *(মাবসূত- ১/১৬৭ পৃ.)*

ফজরের সুন্নাত সালাত ছুটে গেলে ফর্য সালাত আদায়ের পরপরই পড়ে নিবে অথবা সূর্যোদয়ের পরেও পড়তে পারবে।

জিজ্ঞাসা (০৭): ***প্রচলিত আছে গ্রামের কেউ একজন নাকি ইতিকাফ করলেই সকলের আদায় হয়ে যায়। বিষয়টা সহীহ কিনা জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *মো. শাহাদাত হোসেন*
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

জবাব: উক্ত কথা সঠিক নয়। বিশুদ্ধ মতে, ইতেকাফ সুন্নাত। আমাদের সমাজের অনেকে এটাকে ফর্যে কেফায়াহ মনে করে তাই গ্রামের পক্ষে একজনকে ইতেকাফ করায়। এটা ঠিক নয়; বরং বিদ্যানগণের বিশুদ্ধ মতে ইতিকাফ সুন্নাত। *(বাহরুর রায়েক- ৬/২৯৮)*

ইবনুল মুনযির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আলিমগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মত (ইজমা) যে, ইতিকাফ একটি সুন্নত, মানুষের ওপর তা ফর্য নয়। তবে কেউ যদি নিজের ওপর মান্নত (নযর) করে ইতিকাফ আবশ্যক করে নেয়, তাহলে তা তার জন্য অবশ্যই পালনীয় (ওয়াজিব) হবে।" *(আল-ইজমা- পৃ. ৫৩; আরো দেখুন: ফিকহুল ইতিকাফ- ড. খালিদ আল-মুশাইখিহ, পৃ. ৩১)*

জিজ্ঞাসা (০৮): ***আমি রমাযানে ১০ দিনের নিয়তে ইতিকাফ করি। মূলত শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী'র বই পড়ে এটার জন্য আমি অনুপ্রাণিত হয়। আমাদের মসজিদে এর পূর্বে শুধু মাত্র ৩ দিন ইতিকাফ হতো। সে জন্যই গ্রামবাসী (মূলত মসজিদ কমিটি) খুশি হয়ে ইতিকাফকারীদের হাদীয়া দেয় (যদিও প্রত্যেক বছর দেয়। কিন্তু এবার আমি ইতিকাফে ছিলাম সে জন্য আমার জানা প্রয়োজন)। আমার প্রশ্ন হলো– এভাবে ইতিকাফকারীর হাদীয়া নেওয়া কি জায়িয? আর যদি সেটা ফিতরার/মসজিদের টাকা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বিধান কি?***
মো. শাহাদাত হোসেন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

জবাব: ইতিকাফ করার কারণে সমাজবাসী খুশি হয়ে কিছু হাদীয়া দিলে তা গ্রহণ করা বৈধ। কেননা হাদীয়ার মূল হচ্ছে তা বৈধ। তবে যদি উক্ত হাদীয়া ফিতরা থেকে বা মসজিদের মূল ফান্ড থেকে হয় তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানী।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***আমি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলব। আমার কোনো মূলধন নেই। এজন্য কয়েকজনের কাছ থেকে ব্যবসার অংশীদারিত্ব হিসেবে টাকা নিব। তাদেরকে বলা হয়েছে ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হবে তার ৩০% আমি নিব এবং বাকি ৭০% মুনাফা তাদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করব। এই নিমিত্তে প্রতি মাসে কিছু অনির্ধারিত টাকা প্রদান করা হবে অর্জিত মুনাফা থেকে। বছর শেষে হিসেব করে সম্পূর্ণ মুনাফা বন্টন করা। আমার এই পদ্ধতি হালাল হবে কি-না?*** *মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন*
৫০৪ পূর্ব সনাতনগড়, হাজারীবাগ, ঢাকা।

জবাব: হ্যাঁ, হালাল হবে। এটাকে শারঈ পরিভাষায় মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ বলা হয়। আপনারা যে শর্ত করেছেন তা বৈধ আছে। রাসূল (ﷺ) বলেন, মুসলিম সমাজে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বৈধ। ইমাম আহমাদের বর্ণানয় রয়েছে– তবে এমন সন্ধি বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে। সুলাইমান ইবনু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: মুসলিমরা নিজেদের (চুক্তিপত্রের) শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য। *(আবূ দাঊদ- ৩৫৯৪, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (১০): ***সাত ভাগে কোরবানি করা যাবে কি? সাত ভাগ বলতে সাতটা পরিবারের একসাথে কুরবানী করবে, না সাতটা লোক মিলে করতে হবে? সহীহ হাদীস দিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।*** *মোহাম্মদ বিপুল হোসেন*
ঝিনাইদহ

জবাব: সাত ভাগে কুরবানি করা যাবে চাই তারা এক পরিবারের হোক বা সাত পরিবারের।

আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহকে কুরবানিতে অংশীদার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন: "একটি উট বা একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট (বৈধ) হবে। তারা একই পরিবারের হোক বা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের হোক, তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক সব ক্ষেত্রেই তা বৈধ। কারণ, নবী (ﷺ) সাহাবীগণকে একটি উট ও একটি গরুতে সাতজন করে অংশীদার হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকার পার্থক্য বা শর্ত আরোপ করেননি।"
(ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- খণ্ড ১১, পৃ. ৪০১)

মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন তাঁর "আহকামুল উধহিয়্যাহ" গ্রন্থে বলেছেন: "একটি ছাগল বা ভেড়া একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট (বৈধ) হয়। আর একটি উট বা গরুর এক-সপ্তমাংশ (১/৭) সেই ক্ষেত্রেই যথেষ্ট হবে, যে ক্ষেত্রে একটি ছাগল বা ভেড়া যথেষ্ট হয়।"

সুতরাং যারা বলে, সাতজন এক পরিবারের হতে হবে বা শুধুমাত্র সাতজনের কুরবানি হবে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে হবে না, তাদের কথা সঠিক নয়।

ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নাওয়াবী তাঁর শারহু সহীহ মুসলিম-এ বলেছেন: "এই হাদীসগুলো থেকে হাদিয়ে (হজ্জের কুরবানিতে) অংশীদার হওয়া বৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর আলেমগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মত যে, একটি ছাগল বা ভেড়ায় অংশীদার হওয়া বৈধ নয়।

এ হাদীসগুলো আরো প্রমাণ করে যে, একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং একটি গরুও সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। প্রতিটি উট বা গরু সাতটি ছাগল বা ভেড়ার সমতুল্য। এমনকি যদি কোনো ইহরামধারীর ওপর (শিকারজনিত কাফফারা ব্যতীত) সাতটি দম (কুরবানি) ওয়াজিব হয় এবং সে এর পরিবর্তে একটি উট বা একটি গরু জবাই করে, তবে তা তার সবগুলোর পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হবে।" *(শারহু মুসলিম- হা. ১৩১৮ দ্র.)*

জিজ্ঞাসা (১১): ***পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে কেউ যদি এক ওয়াক্ত সালাত ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে তাহলে কি সে পুরোপুরি কাফের হয়ে যাবে। আর যদি না হয় তাহলে এভাবে কত দিন, কত রাকআত সালাত ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করলে অথবা সুনির্দিষ্ট কত দিন ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করলে সেই মানুষটা পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যাবে জানিয়ে বাধিত করিবেন। আর যদি সে এর কারণে কাফের হয়ে যায় তাহলে কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অটোমেটিক তালাক হয়ে যাবে? আর যদি তালাক হয়েই যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির করণীয় কি? (বি. দ্র. দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায়কারী)। আরেকটা কথা হলো যে, তালাক হয়ে যাওয়ার পরে এই সম্পর্কটি পুনরায় আগের অবস্থায় নেওয়া যাবে না? আর যদি পুনরায় নেওয়া যায়, তাহলে এটার জন্য কি কি কাজ করতে হবে?***

নজরুল ইসলাম বিন হাদিস, ফতেপুর-মদন-নেত্রকোনা।

জবাব: যেসব আলেম সালাত ত্যাগকারীকে কাফের বলেন, তাঁদের মধ্যেও কোনো ধরনের সালাত ত্যাগ কুফ্র সাব্যস্ত করে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

একদল আলেম বলেন: যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ফর্য সালাতও এমনভাবে ত্যাগ করল যে তার সময় শেষ হয়ে গেল, সে কাফের হয়ে যাবে। এটি ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখের মত। সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে আব্দুল আজিজ বিন বাজ (রাহিমাহুল্লাহ) ও এই মত গ্রহণ করেছেন। *(ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ৫/৪১ এবং মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বাজ-২৯/১৭৯)*

অন্য একদল আলেম বলেন: যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে, সে হলো যে সম্পূর্ণরূপে সালাত ত্যাগ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো সালাত পড়ে, আবার কখনো ছেড়ে দেয় সে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়ার মতো কুফরে লিপ্ত হয় না, যদিও সে অত্যন্ত বড় গুনাহ করেছে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "অনেক মানুষ বা অধিকাংশ মানুষই বহু অঞ্চলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করে না, আবার তারা সম্পূর্ণরূপেও সালাত ত্যাগকারীও নয়; বরং তারা কখনো সালাত আদায় করে, আবার কখনো তা ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যে ঈমানও আছে, নিফাকও আছে। আর উত্তরাধিকারসহ ইসলামের প্রকাশ্য বিধানসমূহ তাদের ওপর কার্যকর হবে।"

(মাজমূ' আল-ফাতাওয়া- ৭/৬১৭)

তবে যে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই তা হলো– যে ব্যক্তি একটি ফর্য সালাত ফজর হোক বা অন্য কোনো সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে ত্যাগ করল যে তার সময় শেষ হয়ে গেল, সে অত্যন্ত বড় গুনাহের দরজা উন্মুক্ত করল। এ গুনাহ চুরি, মদপান ও ব্যভিচারের চেয়েও ভয়াবহ। এরপর তার অবস্থা দু'টি মতের একটির অন্তর্ভুক্ত হবে– হয় সে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফাসিকদের একজন যতক্ষণ না সে তাওবাহ্ করে এবং সালাতে ফিরে আসে। অথবা সে কাফের যেমন বহু আলেম এ মত গ্রহণ করেছেন; বরং এ মতটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবিদের একটি দল থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

অতএব প্রশ্নকারী ভাই এবং আমাদের সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি নসীহত হলো– আমরা যেন সালাত আদায়ে প্রতিযোগিতা করি এবং কখনোই তা অবহেলা না করি। কারণ সালাতই দ্বীনের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত নষ্ট করে, সে অন্য বিষয়গুলো নষ্ট করার ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রবণ হয়। যদি কোনো মুসলিম কোনো সময় এ ফর্য আদায়ে ত্রুটি করে ফেলে, তাহলে তার কর্তব্য হলো– আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করা, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা, নফল ইবাদত বৃদ্ধি করা এবং (যারা কাযা আদায়কে ওয়াজিব বলেন তাদের মতে) ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা আদায় করা। এ কারণে তার বিবাহের আকদ নতুন করে করার প্রয়োজন নেই। ইন্ শা-আল্লাহ তার বিবাহের আকদ সহীহ ও বহাল থাকবে। কারণ বিশুদ্ধতর আলেমদের মত অনুযায়ী একটি মাত্র সালাত ত্যাগ করার কারণে বিবাহ ভেঙে যায় না। এটাই রাজেহ ও সঠিক মত। ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) এ মত গ্রহণ করেছেন। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১১৪৪২৬)*

জিজ্ঞাসা (১২): ***আমাদের দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে সকল ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি ফুটপাতে ব্যবসা করতে চাই সে ক্ষেত্রে আমি যদি ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করি তাহলে কি আমার উপার্জন হারাম হবে?***

মজনু রহমান, গাজীপুর।

জবাব: না, শুধু ট্রেড লাইসেন্স না থাকার কারণে আপনার ব্যবসার উপার্জন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারাম হয়ে যায় না। তবে

আইনগতভাবে যদি ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তা করা উচিত এবং এসরকারি আইন মেনে চলা আবশ্যক। ইসলামে ব্যবসা হালাল, যদি ব্যবসার পণ্য ও লেনদেন হালাল হয় এবং প্রতারণা, সুদ, জুয়া বা অন্য কোনো হারাম বিষয় না থাকে।

রাষ্ট্র যদি জনস্বার্থে এমন নিয়ম করে যা শরিয়তের বিরোধী নয় (যেমন- ট্রেড লাইসেন্স, স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ইত্যাদি), তাহলে মুসলিমের উচিত তা মেনে চলা।

তাই ট্রেড লাইসেন্স না করা একটি আইন লঙ্ঘন হতে পারে, কিন্তু এ কারণে বিক্রয় থেকে অর্জিত অর্থ নিজেই হারাম হয়ে যায় এ কথা সঠিক নয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈধ আইন অমান্য করা গুনাহের কারণ হতে পারে।

আরেকটি বিষয় হলো– ফুটপাতে ব্যবসা যদি এমন জায়গায় করেন যেখানে সরকার বা সিটি কর্পোরেশন নিষিদ্ধ করেছে, অথবা মানুষের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বা অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে, তাহলে সেটি পাপের কারণ হবে। কারণ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা নেকি তাহলে এর বিপরীতে রাস্তায় কষ্টদায়ক জিনিস ফেলা পাপ।

জিজ্ঞাসা (১৩): ***আমার উত্তেজনাবশত হাল্কা পানি বের হয়েছে বলে মনে হয়েছিল কিন্তু আমি নিশ্চিত না। পরে আমি প্রস্রাব এর সময় পানি দিয়ে পরিষ্কার হয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে কমডের পানি আমার পায়জামায় এসে লাগে বলে আমার সন্দেহ জাগে যে, আমার কাপড়েও সেই মজি মিশ্রিত পানি টয়লেট থেকে এসে আমার পায়জামায় পড়েছে। এরপরে পবিত্রতা অর্জন এর পানি পায়জামায় লেগে টয়লেটের সেই উঠে আসা পানির সাথে মিশ্রিত হওয়ার কথা। তার মানে পায়জামাটার অনেকটা জায়গা নাপাক হয়েছে। পরেরবার আমি প্রস্রাব করতে গেলে সেই পায়জামা আমার কামিজ এর সাথে লাগে আর পায়জামাটা কিছু ভেজা ধরনের ছিল। এখন আমার মনে হয় সেই কামিজটাও নাপাক হয়ে গেছে। তারপরে ওযূ করার ফলে পানি এসে আবার ওই কামিজ এ লেগে কামিজ টাও ভিজে যায়। এখন আমার কাছে মনে হয় যে ওই কামিজের ভেজা জায়গায় মানে বুকের উপরে হাত রেখে সালাত পড়ার ফলে আমার হাতেও অই নাপাকি চলে এসেছে। আর আমার হাত ভেজা হওয়ায় আর নাপাকি লাগায় আমার হাত জায়নামাযে লাগার ফলে জায়নামাযও নাপাক হয়ে গেছে। এখন আমি কি করব? অনেকদিন ধরে এই রকমভাবে আমি চিন্তায় ভুগছি। এক জায়গায় নাপাকি লাগলে এইভাবে আমার মনে হয় অনেক জিনিসে নাপাকি ছড়িয়ে গেছে।***

মাহিরা, বরিশাল।

জবাব: আপনার বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে আপনি নাপাকির ব্যাপারে অতিরিক্ত সন্দেহয় (ওয়াসওয়াসায়) ভুগছেন। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো– “নিশ্চিত বিষয় শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে দূর হয় না।” *(বুখারী- ১৩৭)*

আপনি বলেছেন, “হালকা পানি বের হয়েছে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু নিশ্চিত নই।” তাহলে এটিকে মযী বের হয়েছে বলে গণ্য করবেন না। শুধু সন্দেহের কারণে নাপাকির হুকুম হবে না। টয়লেটের পানি কাপড়ে লেগেছে বলে মনে হয়েছে এটিও সন্দেহ। যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিত হন যে নাপাক বস্তুই কাপড়ে লেগেছে, ততক্ষণ কাপড় পাক এটাই ইসলামী বিধান।

এরপর সেই কাপড় অন্য কাপড়ে লেগেছে, হাতে লেগেছে, জায়নামাজে লেগেছে এসবই সন্দেহের ওপর দাঁড়ানো সন্দেহ। এগুলোর কোনো শরয়ী মূল্য নেই।

আপনার করণীয়: সব সন্দেহ উপেক্ষা করুন। কাপড়, শরীর, জায়নামায কোনোটিই নাপাক হয়েছে বলে গণ্য করবেন না, যতক্ষণ না আপনি নিশ্চিতভাবে নাপাকি দেখতে পান বা নিশ্চিত জানেন। একবার ধুয়ে বা পরিষ্কার করে ফেললে বিষয়টি শেষ। এরপর আর বারবার চিন্তা করবেন না। এ ধরনের চিন্তা বারবার এলে “আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম” পড়ুন এবং সেই চিন্তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়। *(বুখারী- ৩২৭৬)*

সুতরাং শয়তান বিভিন্নভাবে মু'মিনকে ওসওয়াসায় ফেলতে চায়। যখন এমন সন্দেহ হবে তখন শয়তান থেকে পরিত্রাণের জন্য আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়তে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***আমাদের বাসার সামনে একটি খাল রয়েছে, যার এপার থেকে ওপারে যাতায়াতের জন্য একটি বাঁশের সাঁকো ছিল। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন খাল সংস্কারের কাজ করছে, যার ফলে সাঁকোটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই সাঁকো দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পারাপার হতো, যাদের মধ্যে দিনমজুর, নিম্ন আয়ের মানুষ এবং ডেলিভারি ম্যানদের সংখ্যা অনেক। এমন পরিস্থিতিতে, যাকাতের টাকা ব্যবহার করে কি এই বাশের সাঁকো পুনর্নির্মাণ করা বৈধ হবে? উল্লেখ্য, সিটি কর্পোরেশন সংস্কার কাজ শেষ হলে একটি ভালো রাস্তা নির্মাণ করবে, যার ফলে এই সাঁকোর প্রয়োজন আর থাকবে না। তবে যদি এখন সাঁকো পুনর্নির্মাণ করা হয়, সেটি ১ দিন, ১ সপ্তাহ, ১ মাস বা ১ বছর স্থায়ী হতে পারে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে লোকাল ২ জন, কিছু বাশ দিয়ে***

কোনোরকম একটা সাকো তৈরি করেছে, আমি যাকাতের টাকা দিয়ে আরো বেশি বাশ ব্যবহার করে সাকোটাকে মজবুত করে তৈরি করতে চাই। এ বিষয়ে ইসলাম কী বলে? *হাসিবুল হুসাইন, মিরপুর, ঢাকা।*

জবাব: যাকাতের অর্থ রাস্তা মেরামত, সেতু নির্মাণ বা এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা বৈধ নয়। কারণ, এসব খাত আল্লাহ তা'আলা যেসব খাতে যাকাত ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছেন, তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহ বলেন: "যাকাত তো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আত্-তাওবাহ্: ৬০)

যাকাতের অর্থ কেবল কুরআনে উল্লেখিত আটটি নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা বৈধ। তাই রাস্তা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, স্কুল, হাসপাতাল বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। তবে যাকাতের টাকা দিয়ে এটা না মেরামত করে যদি মূল টাকা দিয়ে এটা করেন তাহলে তা সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে গণ্য হবে।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয সালাতের ইকতিদা করা যাবে? যদি যায় তাহলে তারাবির সালাত আদায়কারীর পিছনে 'ইশার সালাত পড়ার পদ্ধতি কি? আর ইকতিদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো ইমামের অবস্থা মুক্তাদির চেয়ে নিম্ন মানের না হওয়া এটার ব্যাপারে কিছু জানতে চাই?*** *মো. হিজবুল্লাহ, কিশোরগঞ্জ।*

জবাব: নফল সালাত আদায়কারীর পিছনে ফর্য সালাত আদায় করা যাবে যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের ইমামাত করতেন। ***(বুখারী- ৭০১, ৭০৫, ৭১১, ৬১০৬)***

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, মু'আয রাসূলের সাথে 'ইশা ফর্য পরে তার সম্প্রদায়ের ফর্য সালাতের ইমামতি করেছেন।

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) শিরোনাম নিয়ে এসেছেন, নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামাত করা।

সুতরাং নফল সালাত আদায়কারীর পিছনে ফর্য সালাত আদায় করতে কোনো বাঁধা নেই। আপনি যা উল্লেখ করেছেন যে, "ইকতিদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো ইমামের অবস্থা মুক্তাদির চেয়ে নিম্ন মানের না হওয়া।" এটা উক্ত হাদীস পরিপন্থী তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তারাবির সালাত আদায়কারীর পিছনে 'ইশার সালাত আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, আপনি 'ইশারের নিয়তে দাঁড়াবেন, ইমাম সালাম ফিরালে আপনি দাঁড়িয়ে বাকি সালাত পূর্ণ করবেন।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***আমাদের সমাজটা অনেক বড় প্রায় ৪৫০টি ঘর হবে। ইদানিং কিছু লোক সমাজের সকলের অনুমতি না নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো ওয়াক্তিয় মসজিদকে জামে মসজিদ নামকরণ করে জুমু'আর সালাত আদায় করতেসে এটা কি ঠিক হয়েছে। অনেকে বলেন, এটা মসজিদে যেরা হবে। এই মসজিদে সালাত আদায় করার বিধান কি?***

সিয়াম খান, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

জবাব: মূলনীতি হলো– একটি এলাকায় একাধিক জুমু'আর জামা'আত প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তবে শহর বা জনপদ অনেক বড় হলে এবং লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে প্রয়োজন দেখা দিলে একাধিক জুমু'আহ্ প্রতিষ্ঠা করা বৈধ।

ফকীহগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোনো শরয়ী প্রয়োজন ছাড়াই একাধিক জুমু'আহ্ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে শুদ্ধ জুমু'আহ্ হবে সেই জুমু'আহ্, যেটি অন্যগুলোর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"কাশ্শাফুল কিনা'" *(২/৩৯)*-এ বলা হয়েছে– "একটি শহরে একাধিক স্থানে জুমু'আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা বৈধ, যদি তার প্রয়োজন থাকে। যেমন- শহরের একমাত্র জামে মসজিদে সকল মুসল্লির জায়গা না হওয়া, শহরের কোনো অংশের লোকদের জন্য জামে মসজিদ অনেক দূরে হওয়া। অথবা এ ধরনের অন্য কোনো প্রয়োজন, যেমন- শহর অনেক বড় হওয়া এবং এর বিভিন্ন প্রান্ত একে অপর থেকে অনেক দূরে হওয়া।

এসব ক্ষেত্রে আগে বা পরে প্রতিষ্ঠিত উভয় জুমু'আই সহীহ হবে। কারণ, বৃহৎ নগরীগুলোতে বহু স্থানে জুমু'আহ্ আদায় হয়ে আসছে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি বর্ণিত হয়নি, ফলে এটি ইজমার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছাড়া একটি শহরে একাধিক স্থানে জুমু'আহ্ বা ঈদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা হারাম।

আল-মুবদি' গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'এ বিষয়ে 'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) ছাড়া অন্য কারো মতভেদ আমাদের জানা নেই'।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যদি ব্যক্তিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, মুসল্লিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, আগে থেকেই যথেষ্ট জামে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও অকারণে আরেকটি জুমু'আহ্ চালু করা অথবা মুসলিম সমাজে ফিতনা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নতুন জুমু'আহ্ চালু করা হয় তাহলে তা হারাম হবে ও মসজিদে যিরার হিসেবে চিহ্নিত হবে। এ মসজিদে সালাত আদায় করা যাবে না।

তবে যদি উল্লিখিত বৈধ কোনো কারণে আলাদা জামে মসজিদ করে তাহলে বৈধ হবে ও সালাত আদায় করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***আমি বাৎসরিক চুক্তিতে বিভিন্ন গার্মেন্টসে নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রাক অথবা নিজস্ব ট্রাক না থাকলে ভাড়া করে গার্মেন্টসের মালামাল পরিবহনের জন্য ট্রাক পাঠায়। মাসে দেড় থেকে দুই কোটি টাকা আমার লেনদেন হয়। আমি মাসে মাসে বিল করি এবং জমা দিই। তারা প্রতি মাসেই বিল ৭০-৮০ ভাগ বিল পরিশোধ করে এবং কিছু বাকি থাকে। প্রতি মাসেই কিছু কিছু টাকা বাকি থাকে। এটার পরিমাণে বছর শেষে তিন-চার কোটি টাকা হয় এবং বছর শেষে কিছু পেন্ডিং বিলও থাকে। এখন আমার প্রশ্ন হলো– গার্মেন্টসের নিকট এই বকেয়া পাওনা (যা আমার হাতে নেই) এবং হাতে বিল (পেন্ডিং)-এর উপর যাকাত দিতে হবে কিনা? চুক্তি থাকার কারণে তারা টাকা দিতে এবং পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।***

মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।

জবাব: উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে। যেহেতু আপনি উল্লেখ করেছেন যে, তা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি বা নিশ্চিত। এ বিষয়ে ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ দায়েমা (৯/১৯০)-কে প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা বলেন,

“যার কোনো সচ্ছল (পরিশোধে সক্ষম) ব্যক্তির কাছে এমন ঋণ বা পাওনা রয়েছে, যা নিজেই নিসাব পরিমাণ বা তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ করে, তবে সেই পাওনার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সে যখন সেই পাওনা আদায় করবে, তখন বিগত সময়ের জন্য তার যাকাত আদায় করবে; তা এক বছরের হোক বা একাধিক বছরের হোক। আর যদি পাওনা হাতে পাওয়ার আগেই প্রতি বছর এর যাকাত আদায় করে দেয়, তবে সেটিও উত্তম।” একই মত ব্যক্ত করেছেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ও ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুমাল্লাহ)।

জিজ্ঞাসা (১৮): ***আমার স্ত্রীর এই সম্পদ আছে। সে আমার উপর নির্ভরশীল। তার কোনো আয়ের উৎস নেই। এমতাবস্থায় তার উপর কি যাকাত ফরয হয়েছে? সাড়ে ৭ ভরি সোনার নেসাবে হিসেব করতে চাই। এই ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণের নেসাবে হিসেব করলে কি কোনো গুনাহ হবে? সহীহ হাদীস জানতে চাই। স্বর্ণ = ৪ ভরি ৩ আনা ৬ রতি। রুপা = ২ ভরি। নগদ টাকা = ১৫০০০০।***

মো. রুহুল আমিন, মিরপুর, ঢাকা।

***জবাব:* প্রথমত,** কারো কাছে নেসাব পরিমাণ অর্থ থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে চাই তার আয়ের উৎস থাকো বা না থাকো।

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণে নেসাব ২০ দিনার বা ২৪ ক্যারেটে ৮৫ গ্রাম বা সাড়ে সাত ভরি। রুপার নেসাব ২০০ দিরহাম বা ৫৯৫ গ্রাম রুপা বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি। স্বর্ণ দিয়ে রুপার বা রুপা দিয়ে স্বর্ণের নেসাব পূর্ণ করতে হবে না এটাই বিশুদ্ধ মত। তবে যদি টাকা থাকে তাহলে টাকা দিয়ে স্বর্ণ বা রুপার নেসাব পূর্ণ করতে হবে।

এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, টাকার যাকাতের ক্ষেত্রে স্বর্ণকে মূল হিসেবে ধরা হবে না রুপাকে। এটা নিয়ে উলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ আলেম রুপাকে মূল হিসেবে নিয়েছেন। যেহেতু সেটা গরীবদের জন্য উপকারী।

তবে আমরা যেটা বিশুদ্ধ মনে করি তা হলো, স্বর্ণের নেসাব হলে যাকাত দেওয়া ফরয আর রুপার নেসাব যাকাত দেওয়া উত্তম ফরয হবে না। মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য রুপার নেসাব যাকাত দেওয়াই ভালো।

এখন আপনার বিষয়: এককভাবে স্বর্ণে বা রুপাতে যাকাত হচ্ছে না যেহেতু নেসাব পরিমাণ হয়নি। কিন্তু রুপার নেসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র ক্যাশ টাকাতেই যাকাত হচ্ছে। আর স্বর্ণে নেসাব ধরলে ক্যাশ টাকা ও স্বর্ণ মিলেও যাকাত হচ্ছে না। আপনার জন্য উত্তম হবে, ক্যাশ টাকা ও রুপা মিলিয়ে যাকাত আদায় করা।

তবে আপনি যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে, সোনার হিসেবে যাকাত দিলে কি পাপ হবে?

বিশুদ্ধ মতে, পাপ হবে না। তাই আপনার ক্যাশ টাকা ও স্বর্ণ মিলে নেসাব পূর্ণ না হওয়ায় যাকাত দিতে হবে না। আল্লাহ তা‘আলা ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***কোনো ভাই কি তার বোনকে যাকাত দিতে পারবে? যদিও সেই বোনের স্বামী নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক। কিন্তু স্ত্রীর ভরনপোষণে কিছুটা সমস্যাগ্রস্থ। মহান আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।***

রাসেল হুসাইন
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব: যদি বোন ফকির বা মিসকল বা আয়াতে উল্লেখিত ৮ শ্রেণীভুক্ত কোনো এক শ্রেণীর হন তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

সলেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, পুরুষ বা নারী উভয়ের জন্যই তাদের যাকাত দরিদ্র ভাই, দরিদ্র বোন, দরিদ্র চাচা, দরিদ্র ফুফু এবং অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়দের দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এ বিষয়ে সাধারণ দলিলসমূহ প্রযোজ্য; বরং আত্মীয়দের যাকাত দেওয়ার মধ্যে সাদাক্বাহ্ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা উভয় সওয়াবই রয়েছে। কারণ, নবী (ﷺ) বলেছেন: “মিসকীনকে দান করা একটি সাদাক্বাহ্; আর আত্মীয়কে দান করা সাদাক্বাহ্ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা উভয়ই।” *(আহমাদ- ১৫৭৯৪; নাসায়ী- ২৫৮২, সহীহ)*

তবে ব্যতিক্রম হলেন: পিতা-মাতা এবং তাদের ঊর্ধ্বতন (দাদা-দাদি, নানা-নানি) এবং সন্তান-সন্ততি (ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি ইত্যাদি)। এদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না,

যদিও তারা দরিদ্র হন; বরং যদি অন্য কেউ তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেয় এবং ব্যক্তি সামর্থ্যবান হন, তাহলে নিজের সম্পদ থেকেই তাদের ভরণপোষণ করা তার ওপর আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (২০): ***জুমু'আর খুৎবাহ্ মোবাইল দেখে দেখে দেওয়া কি ঠিক? অনেক মসজিদে জুমু'আর খুৎবায় ইমামকে এরকম করতে দেখা যায়।***

মো. রাশিদুল ইসলাম
বল্লা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

জবাব: মোবাইল দেখে খুতবাহ্ দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা হবে না ইন্ শা-আল্লাহ।

মূলনীতি হলো– জুমু'আর খুতবা তাৎক্ষণিকভাবে (মুখস্থ বা নিজস্ব ভাষায়) প্রদান করা। তবে যদি খুতবায় নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ হয়: আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও সানা, উপদেশ ও নসীহত অন্তর্ভুক্ত থাকা, তাহলে তা একটি কাগজে লিখিত থেকে পড়ে শোনালেও খুতবা সহীহ ও যথেষ্ট হবে। আমরা কোনো আলেমের কাছ থেকে এমন শর্ত পাইনি যে, খুতবা অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে (মুখস্থ বা লিখিত ছাড়া) দিতে হবে; অন্যথায় তা সহীহ হবে না।

(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ৪৫৩৭৮)

জিজ্ঞাসা (২১): ***ইফতার এবং সেহেরি-এর সময়সূচি প্রসঙ্গে। এক এক জায়গায় এক এক সময়সূচি দেওয়া। আমি সূর্য অস্ত এর সাথে সাথে ইফতার করি। কিন্তু এখানকার এলাকার সময় সূর্য অস্ত জাওয়ার ২ থেকে ৩ মিনিট পর ইফতার এর সময় দেওয়া। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?***

আবূ সালেহ মুহাম্মাদ রাসেল
চৈতা, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালি।

জবাব: আপনার করণীয় হলো সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করা। এ বিষয়ে নবী (ﷺ) বলেছেন:

"যখন রাত এদিক থেকে আসে, দিন ওদিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায়, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে।" *(বুখারী- ১৯৪১)*

আরো বলেছেন: "মানুষ ততদিন কল্যাণের ওপর থাকবে, যতদিন তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে।" *(বুখারী- ১৯৫৭)*

অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত রমাযানের সময়সূচিতে সতর্কতামূলক ২-৩ মিনিট পরে ইফতারের সময় দেওয়া হয়, যাতে কেউ ভুলবশত সূর্যাস্তের আগেই ইফতার না করে বা ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয় গবেষণার ভিত্তিতে। তাই ক্যালেন্ডারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সরাসরি সূর্য দেখে ইফতার করাই উত্তম ও অধিক নিরাপদ।

সেহরির ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। সুবহে সাদিক (ফজরের সময়) শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত খাওয়া বৈধ। অনেক সময়সূচিতে ২-৩ মিনিট আগে "সতর্কতামূলক" সময় দেওয়া হয় যা সঠিক নয়। শরয়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা শুরু হয় ফজরের সময় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

জিজ্ঞাসা (২২): ***মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেবকে দিয়ে প্রতিদিন ফজরের সালাতের পরে কবর যিয়ারতে বাধ্য করা কতটুকুন শরিয়তসম্মত। উম্মতের উপকারের স্বার্থে কুরআন সুন্নাহর সহীহ দলিল সহকারে উত্তর জানিয়ে সঠিক সমাধান দিতে বিজ্ঞ শায়েখ দের মর্জি কামনা করি।***

মিজানুর রহমান খান, জালালপুর, সিলেট।

জবাব: মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে প্রতিদিন ফজরের সালাতের পরে কবর জিয়ারত করতে বাধ্য করা বা এটিকে নিয়মিত দায়িত্ব বানিয়ে দেওয়া শরিয়তসম্মত নয়; বরং তা বিদআত হবে। কবর জিয়ারত সুন্নত, কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বাধ্যতামূলক নিয়ম শরিয়তে নির্ধারিত নেই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো; কারণ তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম- ৯৭৭)*

সুতরাং কবর জিয়ারত করতে হবে একাকী যাতে পরকালের কথা স্মরণ হয়। দলবদ্ধভাবে বা অন্যকে দিয়ে নয়।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কবর জিয়ারত করতে হয় নিজের জন্য, কবরবাসীর জন্য না। কারণ রাসূল হাদীসে উল্লেখ করেছেন, কবর জিয়ারত পরকালের কথা স্মরণ করে দেয়। তিনি একথা বলেননি যে, এর মাধ্যমে কবরবাসীর কল্যাণ হয়; বরং যেকোনো স্থান থেকে কবরবাসীর জন্য দু'আ করলে সে দু'আ তার কাছে পৌঁছে যাবে।

রাসূল (ﷺ), খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন নিয়মিত 'আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম শাতেবী উল্লেখ করেছেন যে, শরিয়তে নির্ধারিত নয় এমন সময়, স্থান বা পদ্ধতিকে ইবাদতের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। *(আল-ই'তিসাম- ৩১৮)*

জিজ্ঞাসা (২৩): ***ইসলামে পররাষ্ট্র নীতি আছে কি?***

মো. সজল হোসাইন
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

জবাব: হ্যাঁ, ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy/السِّيَاسَةُ الْخَارِجِيَّةُ) রয়েছে। যদিও কুরআন ও সুন্নাহে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় "পররাষ্ট্রনীতি" শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তবে অন্য রাষ্ট্র, জাতি ও অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের নীতিমালা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনের ভিত্তি

১. শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচার: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

"যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।" *(সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৮)*

১. চুক্তি রক্ষা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।"

(সূরা আল-মায়িদাহ- ১)

২. শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

"তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ো।" *(সূরা আল-আনফাল: ৬১)*

সুন্নাহর ভিত্তি

রাসূল (ﷺ) বিভিন্ন গোত্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করেছেন, দূত পাঠিয়েছেন এবং বিদেশি শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। এর মধ্যে হেরাক্লিয়াস, খসরু দ্বিতীয় এবং আল-মুকাওকিস এর নিকট প্রেরিত পত্রগুলো সুপরিচিত।

এছাড়া হুদায়বিয়া চুক্তি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যেখানে মুসলিম রাষ্ট্র কৌশলগত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিল।

রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মীকে কতল করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।' *(বুখারী- ৩১৬৬)*

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নীতিমালা হচ্ছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বৈধ চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা, আগ্রাসন না করা এবং আগ্রাসনের জবাব দেওয়া। শান্তির সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করা। কূটনৈতিক প্রতিনিধি (দূত) প্রেরণ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। *(আবূ দাউদ- ২৭৬১, সহীহ; বিস্তারিত জানতে পড়ুন: আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ফিশ-শুউনিদ দাস্তুরিয়্যাহ ওয়াল-খারিজিয়্যাহ ওয়াল-মালিয়্যাহ- লেখক: আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ)*

জিজ্ঞাসা (২৪): ***বিবাহের সময় গায়ে হলুদ দেওয়ার হুকুম কী? এটা কী সামাজিক প্রথা?***

মো. সজল হোসাইন
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

জবাব: বিবাহ উপলক্ষে গায়ে হলুদ ইসলামি শরিয়তের কোনো সুন্নাহ বা ইবাদত নয়। এটি মূলত একটি সামাজিক/সাংস্কৃতিক প্রথা।

আমাদের সমাজে যেভাবে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা পালন করা হারাম। কারণ এখানে নারী পুরুষের অবাধ মিলামিশা, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার, নারীর পর্দা রক্ষা না হওয়াসহ আরো অনেক অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

সাথে সাথে এ গায়ে হলুদ রিতী হিন্দুদের কাছ থেকে এসেছে, তারা মনে করে, "এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।" *(তথ্য সূত্র: হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা- ১০ম শ্রেণী)*

সুতরাং এ অনুষ্ঠান বর্জন করাই উত্তম। রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। *(আবূ দাউদ- ৪০৩১, সহীহ)*

যদি শুধু ঘরোয়া পরিবেশে, কোনো ধর্মীয় মর্যাদা বা সওয়াবের বিশ্বাস ছাড়া, শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে মুক্ত থেকে করা হয়, তাহলে এটিকে সামাজিক রীতি হিসেবে পালন করা যেতে পারে। *(বুখারী- ৩৭৮০)*

জিজ্ঞাসা (২৫): ***কোনো এক মহিলার স্বামী নেশা করে জুয়া খেলে। মহিলার কাছে টাকা পয়সা থাকলে জোর করে মেরে তার থেকে টাকা নিয়ে নেয় এবং জুয়া খেলে শেষ করে দেয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– ওই মহিলার কোনো এক আত্মীয় যাকাতের টাকা তাকে দিতে চাচ্ছে আবার এটাও ভাবছে টাকা দেয়ার সাথে সাথেই তার স্বামী তার থেকে জোর করে টাকা নিয়ে নিবে তাহলে তো তাকে টাকা দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না; বরং তার স্বামীকে তার ওপর অত্যাচার করার সহযোগিতা করছে। এমতাবস্থায় ওই মহিলার আত্মীয় চিন্তা-ভাবনা করেছে যে তার যাকাতের টাকা থেকে একটা অংশ এই মহিলার জন্য প্রতি বছর জমা করবে এবং যখন ওই মহিলার প্রয়োজন হবে তখন তাকে জমা করা পুরো টাকাটা দিয়ে দিবে। সে আরো ভেবেছে যে, ওই মহিলার জন্য যেই টাকাটা জমানো হবে সেটা দিয়ে যদি ওই মহিলার জন্য কিছু জায়গা কিনে দিবে। যদি এটা ইসলামী শরীয়তসম্মত হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকতে পারে যে যেই টাকাটা মহিলা প্রতিবছর জমাবে ওই দরিদ্র মহিলাকে দেয়ার জন্য অথবা সেই টাকা দিয়ে জমি কিনে দিতে চাচ্ছে, সে ব্যাপারে কাউকে জানাচ্ছে কিনা! হ্যাঁ এই ব্যাপারে ওই দরিদ্র মহিলার কোনো এক আত্মীয়কে এবং যে মহিলা টাকাটা জমাবে সেই মহিলার দুই ছেলে এবং স্বামীকে জানিয়ে রাখবে। তাহলে জায়িয হবে কি?***

আবু সা'ঈদ, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জবাব: এ ক্ষেত্রে যাকাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো– যাকাতের মাল যাকে দেওয়া হবে, তাকে তার মালিকানা প্রদান করতে হবে।

আপনি যেহেতু টাকা জমা করছেন ঐ মহিলার জন্য কিন্তু তাকে মালিক বানাচ্ছেন না তাই যাকাত আদায় হবে না।

আপনার করণীয় হচ্ছে– উক্ত টাকা মহিলাকে দিন এবং তাকে পরামর্শ দিন যে, উক্ত টাকা আমার কাছে বা অন্য কারো কাছে জমা রাখো পরে জায়গা কিনার মতো টাকা জমা হলে জায়গা কিনবে নতুবা তাকে টাকা না দিয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দিন। তা না করে শুধুমাত্র তার নিয়তে যাকাতের টাকা আপনার কাছে জমা রাখলে যাকাত আদায় হবে না।

জিজ্ঞাসা (২৬): ***রমাযান মাসে অথবা অন্য কোনো মাসে, সিয়াম থাকা অবস্থায় যদি, মহিলাদের মাসিক হয়, তাহলে তো ঐ সিয়াম বাতিল! তাকে পুনরায় এই সিয়ামের কাযা করতে হবে! আমার প্রশ্ন হচ্ছে– সিয়াম থাকা অবস্থায় যদি, কোনো মহিলার মাসিক হয়, তাহলে সে কি সেই সময়ে পানাহার করে সিয়াম ভেঙে ফেলবে! নাকি মাগরিবের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?***

তামান্না, সাভার, ঢাকা।

জবাব: পানাহার করে সিয়াম ভেঙে ফেলবে। সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৪)* সে মহিলা পিরিয়ড শুরু হওয়ার মাধ্যমে অসুস্থ হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীস এসেছে, মুআযাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে প্রশ্ন করলাম, ঋতুবতী মহিলা সওম কাযা করবে এবং সালাত কাযা করবে না এটা কেমন কথা? তিনি বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যাহ? আমি বললাম, আমি হারূরিয়্যাহ নই; বরং আমি (জানার জন্যই কেবল) জিজ্ঞেস করছি। তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমাদের এরূপ হত। তখন আমাদেরকে কেবল সওম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না। *(মুসলিম- ৬৫০)*

সুতরাং পানাহার থেকে বিরত থাকলে শুধু নিজের কষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না।

জিজ্ঞাসা (২৭): ***মায়ের চরিত্র যদি খারাপ হয় তাহলে সন্তানের কর্তব্য কি?***

সামিউল ইসলাম, খুলনা।

জবাব: মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের অধিকার কখনো বাতিল হয়ে যায় না তিনি যাই করুন না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছরে তার দুধ ছাড়ানো সম্পন্ন হয়। (আমি বলেছি) আমার এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন। আর যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরিক করতে বাধ্য করে, যার ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো এবং যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে; তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব, তোমরা যা করতে।" *(সূরা লুক্বমা-ন: ১৪-১৫)*

যখন আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, পিতা-মাতা মুশরিক হলেও এবং শির্কের দিকে আহ্বান করলেও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে, তাহলে তারা অন্য কোনো গুনাহে লিপ্ত হলে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা তো আরো বেশি প্রয়োজন। তবে কোমলতা ও নম্রতার সঙ্গে তাদের উপদেশ দিতে হবে এবং গুনাহ থেকে দূরে থেকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

মাকে অনৈতিকতা থেকে বিরত রাখতে যে বিষয়গুলো সহায়ক হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে, সন্তানরা যেন তার সঙ্গে সময় কাটায়, তার সঙ্গ দেয়, তার সঙ্গে কথা বলে এবং তাকে একাকী ও কর্মহীন অবস্থায় ফেলে না রাখে। কারণ, অলসতা ও শূন্যতা অনেক সময় নষ্ট হওয়ার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি তার স্বামী না থাকে, তাহলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতা-মাতাকে হেফাজত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (২৮): ***তারাবির সালাতের ইমাম সাহেব সিজদায় সাহু দিলে ভুলবশত আমি সালাম না ফিরিয়েই সিজদায় চলে যাই, ইমাম সাহেবের সাথে সাথে! এতে কি আমার সালাত হবে নাকি পুনরায় আদায় করতে হবে?***

মো. শাহারিয়ার ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

জবাব: সালাত হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ তবে সাহু সিজদার পর আপনাকে সালাম ফিরাতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন, সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়। *(আবূ দাঊদ- ৬১, সহীহ)*

ভুল করে যেটা হয়েছে তার জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)*

জিজ্ঞাসা (২৯): ***বন্যা দুর্গত এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে মানুষের সালাতের ক্ষেত্রে ওযূর বিধান কী হবে যেহেতু***

সেখানকার পানি নোংরা এবং তায়াম্মুমের জন্য শুকনো মাটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর? *আমির হামজা, ময়মনসিংহ।*

জবাব: এ ধরনের পরিস্থিতিতে শরিয়তের মূলনীতি হলো– আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব দেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।"

(সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬)

আরো বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৮৬)*

এ অবস্থায় বিধান নিম্নরূপ:

১. যদি পবিত্র পানি পাওয়া যায়, তাহলে তা দিয়ে ওযূ করতে হবে।

২. যদি পানি না পাওয়া যায়, অথবা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করতে হবে।

৩. যদি বাস্তবেই পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয় এবং তায়াম্মুমের জন্যও কোনো উপযুক্ত বস্তু একেবারেই না পাওয়া যায়, তাহলে তিনি সেই অবস্থায়ই সময়মতো সালাত আদায় করবেন। পরে এ সালাত পুনরায় পড়তে হবে না এটাই বিশুদ্ধ মত।

বি. দ্র. *শুধু পানি ঘোলা বা কাদাযুক্ত হলেই তা অপবিত্র হয়ে যায় না। যদি পানিতে প্রকৃত নাপাক বস্তু মিশে তার রং, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে সেই পানি দিয়ে ওযূ করা যাবে না। কিন্তু শুধু বন্যার কাদাযুক্ত বা ঘোলা পানি, যা নাপাক হওয়া নিশ্চিত নয়, তা মূলত পবিত্র হিসেবেই গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে তা দিয়ে ওযূ করা বৈধ।*

জিজ্ঞাসা (৩০): ***শায়েখ, আমার এ বছর নিয়ে টানা তিন বছর টাইফয়েড জ্বর হয়েছে। যতটুকু মনে পড়ছে, তা শীতকালে হচ্ছে। আমার ঠাণ্ডার সমস্যা আছে এবং এলার্জিরও সমস্যা আছে ও শ্বাসকষ্টেরও সমস্যা আছে। যে কয়দিন ঠাণ্ডার মাস থাকে, প্রতিদিন এলার্জির ও শ্বাসকষ্টের ওষুধ খাওয়া লাগে, না খেলে সর্দি হাঁচি লেগে থাকে। এর জন্য শীতকালে আমি প্রতি সপ্তাহে এক থেকে তিনবার গোসল করি, কিন্তু পরপর কয়েকদিন ফরয গোসল করা লাগে, যদিও গরম পানি ব্যবহার করি এবং প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার ওযূ করা লাগে, তারপরও আমার ঠাণ্ডা লাগে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য লেপ-কাঁথা ব্যবহার করি, বলতে গেলে লেপ-কাঁথা ছাড়া থাকিই না। ডাক্তার দেখিয়েছি, ডাক্তার বলেছেন, "ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার খাবেন না।" কিন্তু তিনি নির্দিষ্টভাবে ওযূ বা গোসল পড়তে নিষেধ করেনি। উল্লেখ্য অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়া এবং টাইফয়েড জ্বর এটা শরীরের জন্য ভালো নয় দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর এবং এ কারণে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে কিনা ডা. বলে নাই। কিন্তু অসুস্থ হলে মনে হয় যেন আর বাঁচবো না। এমতাবস্থায় শীতকাল চলাকালীন আমার গোসল ওযূর ব্যাপারে করণীয় কী? ওযূ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবো?*** *ইকবাল হোসাইন পিরোজপুর।*

জবাব: সত্যিকার অর্থেই যদি পানি ব্যবহার ক্ষতির কারণ হয় তাহলে তায়ামুম করতে পারবেন। তবে যদি গরম পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি না হয় ও পানি গরম করার সুযোগ থাকে তাহলে তায়ামুম করা যাবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।"

(সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬)

আরো বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৮৬)*

ইমাম আবূ দাঊদ তার গ্রন্থে শিরোনাম নিয়ে এসেছেন, ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা হলে নাপাক ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে কি?

'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ হবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের সালাত আদায় করালাম। পরে তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জানালো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: হে 'আম্র! তুমি নাকি জুনুবী অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সালাত আদায় করেছ! তখন আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি মহান আল্লাহর এই বাণীও শুনেছি– "তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান"– ***(সূরা আন্-নিসা: ২৯)***। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না। ***(আবূ দাউদ- ৩৩৪, সহীহ)***

শায়খ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "নবী (ﷺ) তাকে এ কাজের ওপর অনুমোদন দিয়েছেন এবং তাকে সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেননি। কারণ, যে ব্যক্তি ক্ষতির আশঙ্কা করে, সে শরিয়তের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির মতোই, যার বাস্তবেই ক্ষতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো– ক্ষতির আশঙ্কাটি প্রবল বা নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু নিছক কল্পনা বা ভিত্তিহীন সন্দেহ হলে তা কোনো গণ্য বিষয় নয়।" *(মাজমূ' ফাতাওয়া আশ-শায়খ আল-উসাইমীন- ১২/৪০২)*

مَقَالَةُ الغِلَافِ / প্রচ্ছদ রচনা

কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারল সেন্টার

লাতিন আমেরিকায় ইসলামী স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও আন্তঃসভ্যতার সংলাপের এক অনন্য কেন্দ্র

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মীয় স্থাপত্য কেবল ইবাদতের স্থান নয়; বরং একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়, নান্দনিক রুচি, জ্ঞানচর্চা এবং সভ্যতাগত মূল্যবোধের দৃশ্যমান প্রতিফলন। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসের পালের্মো অঞ্চলে অবস্থিত কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার সেই অর্থে লাতিন আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী স্থাপত্য। ২০০০ সালে উদ্বোধনের পর এটি দীর্ঘদিন ধরে লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে এর গুরুত্ব কেবল আয়তন বা স্থাপত্যিক সৌন্দর্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সামাজিক সম্প্রীতির একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিশ শতকের শেষভাগে লাতিন আমেরিকায় আরব অভিবাসী সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাংগঠনিক বিকাশের ফলে একটি বৃহৎ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৫ সালে তৎকালীন আর্জেন্টাইন সরকার বুয়েনস আইরেসের পালের্মো এলাকায় প্রায় ৩৪,০০০ বর্গমিটার জমি বরাদ্দ দেয়। সৌদি আরব সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় এবং ২০০০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এটি ছিল আর্জেন্টিনা ও সৌদি আরবের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সহযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও তুলে ধরে। আধুনিক কূটনীতিতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে “সফট পাওয়ার” (Soft Power)-এর কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার সেই ধারণার একটি বাস্তব উদাহরণ, যেখানে স্থাপত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া সুদৃঢ় হয়েছে।

স্থাপত্যশৈলী: আরব ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রকৌশলের সমন্বয়

সৌদি স্থপতি যুহায়রী ফায়েয-এর নকশায় নির্মিত এই কমপ্লেক্সটি ঐতিহ্যবাহী আরব-ইসলামী স্থাপত্য ও আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তির এক সার্থক সমন্বয়। সম্পূর্ণ কমপ্লেক্সটি কিবলামুখী পরিকল্পনায় নির্মিত, যা ইসলামী স্থাপত্যের মৌলিক নীতির অনুসরণ করে।

প্রবেশপথ অতিক্রম করলেই একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানায়। এই উন্মুক্ততা ইসলামী স্থাপত্যে সমতা, উন্মুক্ততা এবং সামষ্টিক জীবনের প্রতীক। কমপ্লেক্সটির দু’টি সুউচ্চ মিনার প্রায় ৫০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট, যা দূর থেকেই এর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। বিশাল গম্বুজ, ক্রিম রঙের বহির্ভাগ, জ্যামিতিক অলংকরণ এবং আরবি ক্যালিগ্রাফি ইসলামী শিল্প-নন্দনতত্ত্বের উৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

সলাতের জন্য নির্ধারিত প্রধান হলে প্রায় ১,৬০০ জন মুসল্লি একযোগে সলাত আদায় করতে পারবেন; এর মধ্যে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশস্ত অভ্যন্তর, প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার এবং ধ্বনি-প্রতিফলন নিয়ন্ত্রিত নকশা ধর্মীয় পরিবেশকে আরো গম্ভীর ও মননশীল করে তুলেছে।

একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স

কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের বিশেষত্ব হলো, এটি কেবল মসজিদ নয়; বরং একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। কমপ্লেক্সে রয়েছে–

- কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।
- সমৃদ্ধ আরবি ও ইসলামিক গ্রন্থাগার।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।
- আরবি ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র।

∴ অডিটোরিয়াম ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনকক্ষ।

∴ প্রদর্শনী গ্যালারি।

∴ শিক্ষার্থীদের আবাসন।

∴ উন্মুক্ত উদ্যান ও সামাজিক মিলনায়তন।

গ্রন্থাগারটিতে ১০,০০০-এরও বেশি আরবি ও ইসলামিক বিষয়ক গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে, যা লাতিন আমেরিকার অন্যতম সমৃদ্ধ ইসলামিক গ্রন্থসংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত। আর্জেন্টিনার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, বিশেষত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, আরবি ভাষা ও ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদ ছিল শিক্ষা, বিচার ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। মদিনার নববী মসজিদ থেকে শুরু করে বাগদাদের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য পর্যন্ত সেই ধারারই আধুনিক প্রতিফলন দেখা যায় কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে।

এখানে নিয়মিত আরবি ভাষা শিক্ষা, কুরআন অধ্যয়ন, ইসলামের ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সেমিনার, কর্মশালা এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে অমুসলিম দর্শনার্থীদের কাছেও ইসলামী সভ্যতার বহুমাত্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়।

গবেষণামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি কেন্দ্রটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, যার মাধ্যমে আরবি ভাষা, ইসলামিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা বৃহত্তর সমাজে পৌঁছে দেয়।

আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

আর্জেন্টিনা একটি বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্র। সেই বাস্তবতায় কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করে। এখানে নিয়মিত উন্মুক্ত দর্শন, আন্তধর্মীয় সংলাপ, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ দর্শনার্থী এই কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এই কার্যক্রমগুলোর মূল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা– সহনশীলতা, ন্যায়, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ– অমুসলিম সমাজের সামনে উপস্থাপন করা। ফলে কেন্দ্রটি মুসলিম ও অমুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

সভ্যতাগত মূল্যায়ন

বিশ্বের বহু ঐতিহাসিক মসজিদ রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সাম্রাজ্যিক গৌরবের প্রতীক হিসেবে নির্মিত হলেও কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার মূলত জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং আন্তঃসভ্যতাগত সংলাপের প্রতীক। এর স্থাপত্যে যেমন ইসলামী নন্দনতত্ত্বের সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি এর শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম ইসলামের বৌদ্ধিক ঐতিহ্যকে আধুনিক সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় মেরুকরণ ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে এই কেন্দ্রটি প্রমাণ করে যে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেবল উপাসনার স্থানই নয়; বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান, জ্ঞানবিনিময় এবং মানবিক সহযোগিতারও কেন্দ্র হতে পারে। এই কারণেই কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টারকে লাতিন আমেরিকায় ইসলামী সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দূত (Cultural Ambassador) হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

উপসংহার

কিং ফাহাদ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার আধুনিক লাতিন আমেরিকায় ইসলামী উপস্থিতির এক সুদৃঢ় স্থাপত্যিক ও সাংস্কৃতিক দলিল। এটি কেবল একটি মসজিদ নয়; বরং ধর্ম, শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির এক সমন্বিত প্রতিষ্ঠান। স্থাপত্যের নান্দনিকতা, জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং আন্তঃসভ্যতাগত সংলাপ –এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে এই কেন্দ্রটি আজ দক্ষিণ আমেরিকায় ইসলামের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. **25.00**

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ
মোরা ভাঙ্গবোই

কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ২০২৬

০৬ আগস্ট'২৬
বৃহস্পতিবার
সকাল ৯ টা

স্থান
আইডিইবি ভবন
১৬০/এ ভিআইপি রোড
কাকরাইল, ঢাকা

প্রধান অতিথি

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ

বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ এবং জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সভাপতি

মোঃ আব্দুল্লাহীল হাদী

কেন্দ্রীয় সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

info.shubbanbd@gmail.com
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৭৬৫-৮১২২৬১
www.shubbanbd.org

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত